দাম : বারো টাকা

সাভারকর না থাকলে
সুভাষ 'নেতাজী' হতেন না
— পৃঃ ৭

# স্বস্তিকা

পুরুষোত্তম জগন্নাথের
কাঁঠাল চুরি — পৃঃ ১৮

৭৩ বর্ষ, ৪৩ সংখ্যা।। ১২ জুলাই, ২০২১।। ২৭ আষাঢ় - ১৪২৮।। যুগাব্দ ৫১২৩ ।। website : www.eswastika.com

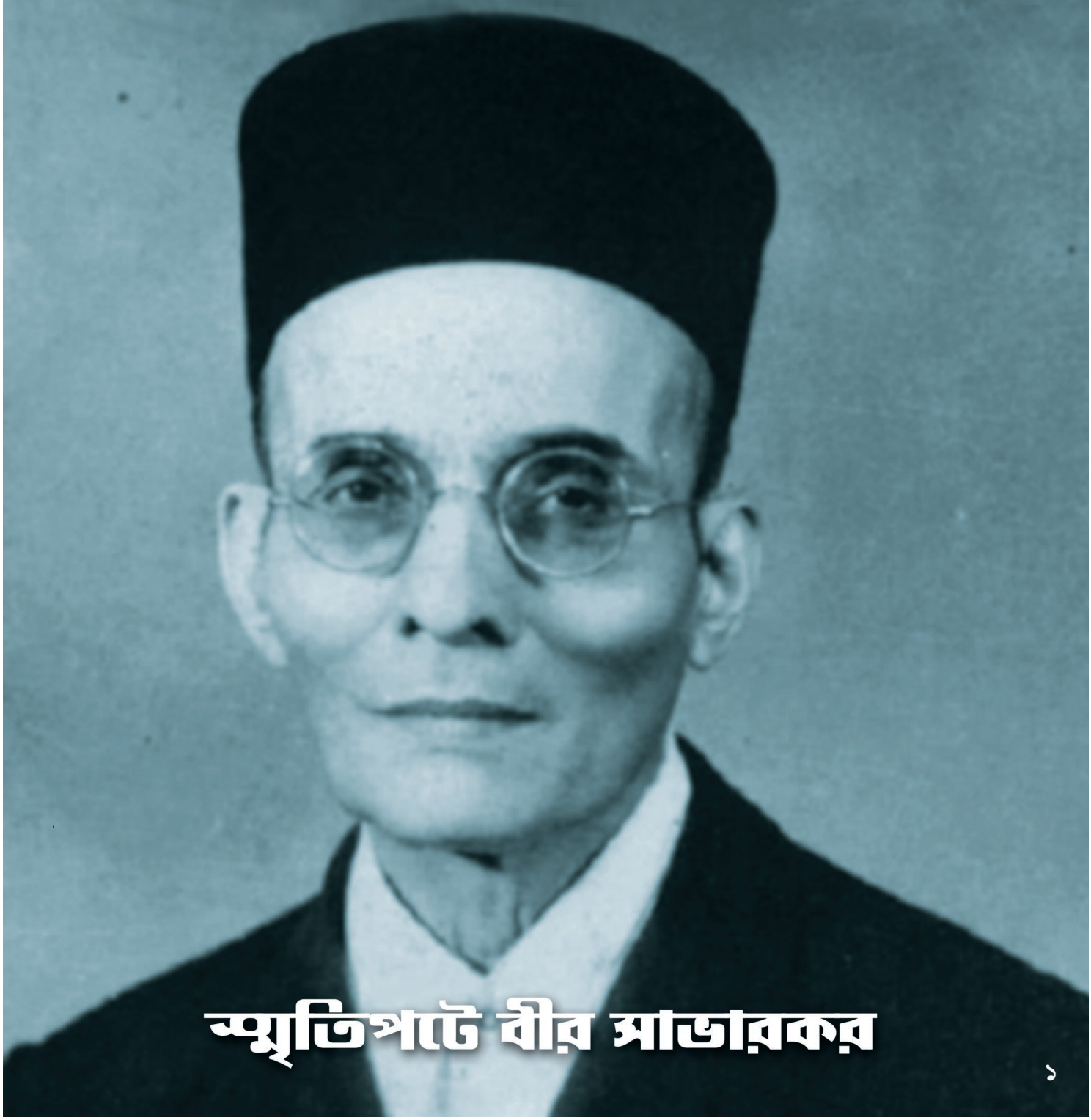

## স্মৃতিপটে বীর সাভারকর

# স্বস্তিকা

*।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।*

৭৩ বর্ষ ৪৩ সংখ্যা, ২৭ আষাঢ়, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

১২ জুলাই - ২০২১, যুগাব্দ - ৫১২৩,

Website : www.eswastika.com


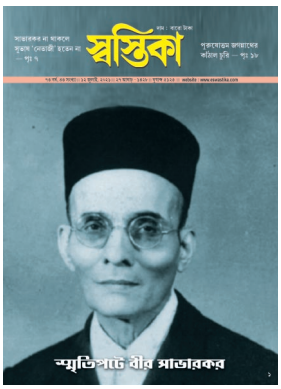



**সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত**

**সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল**

**প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত**

দূরভাষ :

**সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)**

**সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫**

**সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪**

**বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩**

**দাম : ১২ টাকা**

**বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।**

**Postal Registration No.**- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।


## সূচীপত্র


**সম্পাদকীয়** ▯ ৪

**জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারকে কঠোর হওয়া, সময়ের আহ্বান**
▯ রঞ্জন কুমার দে ▯ ৫

**সাভারকর না থাকলে 'নেতাজী' হতেন না**
▯ ডা: আর এন দাস ▯ ৭

**স্মৃতিপটে বারবার বীর সাভারকর**
▯ সৌমিত্র সেন ▯ ১০

**'দিশি' পত্রিকার একমুখী হিন্দু বিদ্বেষ**
▯ সুদীপ নারায়ণ ঘোষ ▯ ১২

**হিন্দু, হিন্দুত্ব এবং চিন্তন-একাদশ**
▯ অনিকেত মহাপাত্র ▯ ১৪

**ভারতে পর্তুগিজ উপনিবেশ অবসানে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ভূমিকা** ▯ সূর্যশেখর হালদার ▯ ১৬

**পুরুষোত্তম জগন্নাথের কাঁঠাল চুরি**
▯ উজ্জ্বল কুমার মণ্ডল ▯ ১৮

*With Best Compliments*
*from :-*

# A
# Well Wisher

## বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**

A/C. No. : **917020084983100**

IFSC Code : **UTIB0000005**

Bank Name :

**AXIS Bank Ltd.**

Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-700 071**

সানরাইজ®
সর্ষে পাউডার

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

# সম্পাদকীয়

## সরসঙ্ঘচালকের বক্তব্য ভারতবর্ষের মর্মকথা

সম্প্রতি গাজিয়াবাদে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত রাষ্ট্রীয় মুসলিম মঞ্চের আহ্বানে বিশিষ্ট ইসলামি বিদ্বান ড. খোয়াজ ইফতিখার আহমেদের লিখিত 'দ্য মিটিং অব মাইন্ডস্—এ ব্রিজিং ইনিশিয়েটিভ' পুস্তক প্রকাশ অনুষ্ঠানে যে বক্তব্য রাখিয়াছেন তাহাতে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির নেতৃবৃন্দের গাত্রদাহ শুরু হইয়াছে। তাঁহারা সরসঙ্ঘচালকের বক্তব্যের অপব্যাখ্যাও করিতেছেন। আসলে ভারতবর্ষের হিন্দু মুসলমানের মনের আদান-প্রদান হউক—ইহা তাঁহারা কোনোদিনই চাননি। তাঁহারা মুসলমানদিগকে শুধুমাত্র ভোটব্যাঙ্ক হিসাবেই দেখিয়াছেন। কংগ্রেস-কমিউনিস্ট-সহ বিরোধী রাজনৈতিকদলগুলি মুসলমান সমাজকে কোনোদিন ভারতীয় হইতেই দেয় নাই। আজ যখন মুসলমান বিদ্বানরাই এই বিষয়ে আগাইয়া আসিতেছেন তখন তাঁহারা জ্বলিয়া উঠিতেছেন। মোহন ভাগবত কোনো নতুন কথার উপস্থাপনা করেন নাই, তিনি ভারতের মনীষীদের কথাই উচ্চারিত করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন—'ভারতবর্ষের মানুষের ডিএনএ একই। এইখানে হিন্দু-মুসলমানের প্রভেদ নাই। তাই হিন্দু-মুসলমান ঐক্য কথাটি নিরর্থক।' জাতপাত লইয়া যাহারা রাজনীতির ব্যবসা করিতেছেন তাঁহারা সরসঙ্ঘচালকের কথা বুঝিতে পারিবেন না।

তথাকথিত রাজনীতিবিদরা সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালকের কথায় চিৎকার করিবে—ইহাতে অস্বাভাবিকতার কিছুই নাই। কিন্তু কতিপয় হিন্দুত্বপ্রেমীও তাঁহার কথায় সমালোচনায় মুখর হইয়া সোশ্যাল মিডিয়ার দেওয়াল ভরিয়া দিতেছেন ইহাই আশ্চর্যের। আসলে তাহারা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘকে বুঝিতেই পারেন নাই। নব্বই বৎসর ধরিয়া নিরন্তর নীরবে সঙ্ঘ রাষ্ট্র নির্মাণের কাজ করিয়া চলিয়াছে, তাহা তাহারা অনুধাবন করিতে পারেন নাই। আজ যে কথা বর্তমান সরসঙ্ঘচালক বলিয়াছেন তাহা সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশববলিরাম হেডগেওয়ার পূর্বেই বলিয়াছেন— 'প্রতিটি মানুষের আত্মরক্ষার অধিকার রহিয়াছে। অপরকে হত্যা করা অবরাধ। আত্মহনন করাও সমান ক্ষতিকারক। ইহার ফলে হিন্দু সমাজের বহুবিধ ক্ষতি হইয়াছে। ভারতবর্ষে পূর্বে সকলেই হিন্দু ছিল। কিন্তু আজ তাহার কয়েক কোটি ধর্মান্তরিত হইয়াছে। এইসব ধর্মান্তরিত মানুষের শরীরে আজও হিন্দুরক্ত প্রবাহিত হইতেছে।'

সুতরাং মোহন ভাগবতের কথায় যাহারা সমালোচনা করিতেছেন তাহারা সঙ্ঘের ভাবটিকে বুঝিতে পারেন নাই। তাহারা অন্ধের হস্তীদর্শনের ন্যায় সঙ্ঘকে অনুধাবন করিয়াছেন। স্বয়ংসেবকদের দীর্ঘ নব্বই বৎসরের সাধনায় সঙ্ঘ আজ ভারতবর্ষের জনমানসে একটি শ্রদ্ধার আসন করিয়া লইয়াছে। আজ দেশে রাষ্ট্রীয়তার যে স্ফুরণ দেখা যাইতেছে তাহা ইহার পরিণাম। সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ হেডগেওয়ারের প্রতিনিধি। তাঁহার পথনির্দেশে লক্ষ লক্ষ স্বয়ংসেবক রাষ্ট্রগঠনের কাজে ভারতমাতার সেবায় নিবেদিত প্রাণ। সরসঙ্ঘচালকের বক্তব্য পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে থাকা স্বয়ংসেবকদের উজ্জীবনী মন্ত্র। তাই তথাকথিত রাজনীতির কারবারিরা তাঁর কথার সমালোচনা করিতেই পারেন কিন্তু নিজেদের হিন্দুপ্রেমী বলিয়া যাহারা ভাবিয়া থাকেন তাহাদের সমালোচনা খুবই দুঃখজনক।

## সুভাষিতম্

**স্বয়ং কর্ম কোত্যত্মা স্বয়ং তৎফলমশ্নুতে।**

**স্বয়ং ভ্রমতি সংসারে স্বয়ং তস্মাদ্‌বিমুচ্যতে।।**

*জীব-সকল স্বয়ং কর্ম করে এবং স্বয়ং তার ফল ভোগ করে। স্বয়ং সংসারচক্রে ঘুরতে থাকে এবং স্বয়ং এর থেকে মুক্তি লাভ করে।*

# জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারকে কঠোর হওয়া, সময়ের আহ্বান

**রঞ্জন কুমার দে**

অসম সরকার শপথ গ্রহণের পর থেকেই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে কঠোর মনোভাব পরিলক্ষিত হয়। সেই সূত্রধরে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে দু' সন্তানের নীতি অসমে শিথিল কার্যকরী থাকলেও এইবার বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প যেমন অরুণোদয়, মুখ্যমন্ত্রী আবাস যোজনা, মাইক্রো ফিন্যান্স ঋণ মহকুব প্রভৃতি সরকারি প্রকল্পে হিতকারীদের নতুন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নীতির মূলনীতি অবশ্যই পূরণ করতে হবে। তবে প্রথমবস্থায় দু' সন্তান নীতি থেকে কিঞ্চিৎ সরে এসে চার-পাঁচ সন্তানের নীতিতে রাখা হয়েছে, ক্রমশ সেটা দু' সন্তানের নীতিতে কমিয়ে আনা হবে। অসমে আগামী পৌরসভা নির্বাচন, পঞ্চায়েত, টাউন কমিটি ইত্যাদিতে কঠোরভাবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নীতি কার্যকারিতার ইঙ্গিত স্পষ্ট পাওয়া গেছে। বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সমীক্ষায় অসমে জনসংখ্যা ভারসাম্যের করুণ দৃশ্য ফুটে উঠেছে, তাই হয়তো জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে লাগাম টানা ছাড়া বিকল্প পথ খোলা নেই। ১৯৯১-২০০১ সময়কালে অসমে হিন্দু জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ১৪.৯ শতাংশের বিপরীতে মুসলমান জনসংখ্যা দ্বিগুণ হারে বৃদ্ধি পেয়ে ২৯.৩ শতাংশে পৌঁছায়। তার পরই ২০০১-২০১১ সালের সাময়িককালে হিন্দু জনসংখ্যার হার কমে ১০.৯ শতাংশ হলেও মুসলমান জনসংখ্যা তিনগুণ বেড়ে দাঁড়ায় ২৯.৬ শতাংশে। অসমে ১৯৭১ সালে মাত্র ২টি সংখ্যালঘু অধ্যুষিত জেলা থাকলেও ২০১১ সাল ধীরে ধীরে সেই সংখ্যা দশে এসে দাঁড়ায়। ১৯০১ সালে বরপেটায় ০.১ শতাংশ মুসলমান আবাদি ২০১১ সালে ৭০.৭৪ শতাংশে পৌঁছেছে। অসমে ২০২১ সালের বিধানসভার ভোটের রিপোর্ট অনুযায়ী গত ৫ বছরে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত মানকাচর, দলগাঁও, ধীঙ, নাওবৈচায়, যমুনামুখ, জনিয়া, রূপহিহাট ও দক্ষিণ শালমারা বিধানসভায় যথাক্রমে ৪৩৮৬৬৪ জন, ৪৩৬৯০ জন, ৪২৯৮৯ জন, ৪২৪৬৩ জন, ৩৯০০৯ জন, ৩৮৫১০ জন, ৩৫০৯০ জন এবং ৩১৬৮৪ জন ভোটার বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে একই সময়ে হিন্দু খিলিঞ্জিয়া অধ্যুষিত পলাশবাড়ি, বিহালি, মাজুলি, থাওড়া এবং সিদলী বিধানসভায় যথাক্রমে মাত্র ২০৪০৯ জন, ১৭৭৬৩ জন, ১৫৬০৯ জন এবং ১৫২২৬ জন ভোটার বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই স্বভাবতই অসমে বিশেষ এক গোষ্ঠীর জনবিস্ফোরণে রাজ্যের অর্থনৈতিক, সামাজিক ত্বরান্বিতে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে এবং জনবিন্যাসে ভূমিপুত্ররা রাজনৈতিক গুরুত্ব হারিয়ে ফেলছে।

স্বাধীনতার পর থেকে জাতীয় সংসদে এখন পর্যন্ত প্রায় ৩৫টি প্রাইভেট মেম্বার বিল জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণকল্পে উত্থাপিত হয়েছে যাদের মধ্যে অধিকাংশই কংগ্রেস সদস্যদের, বিজেপির ৮ সদস্য, টিডিপির ৫, তৃণমূল কংগ্রেস, আরজেডি, সপাদের একজন করে সদস্য বাকি কিছু ক্ষেত্রীয় সাংসদ সদস্যরা উত্থাপিত করেছিলেন। সর্বশেষ বিলটি ২০১৮ সালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সঞ্জীব বালিয়ান উত্থাপিত করেছিলেন। ভারতবর্ষের মতো উন্নয়নশীল দেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ একটি স্পর্শকাতর বিষয়, তারপর ১৯৭৫-৭৭ সালে কংগ্রেসের সঞ্জয় গান্ধী জবরদস্তি বন্ধ্যাকরণে জোর দিলে ভোটব্যাঙ্কে যথেষ্ট প্রভাব পড়ে এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প হিমঘরেই চলে যায়। কিন্তু তৎকালীন সরকারগুলো বিচক্ষণতার সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিলে আজকে জনসংখ্যার বাড়তি বোঝা দেশকে বইতে হতো না। বিগত সরকারগুলো যদি আইন প্রয়োগ করে ন্যূনতম দুই সন্তানের অধিক পরিবারকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ভোটদানে বিরত রাখতো, সরকারি চাকরিতে অগ্রহণযোগ্যতা, অধিক করদানের ব্যবস্থা লাগু করতো তাহলে নিশ্চিত জনসাধারণ স্বেচ্ছায় পরিবার পরিকল্পনা নিয়ন্ত্রণে এগিয়ে আসতো। গত আদমশুমারির (২০১১) রিপোর্ট অনুযায়ী ২০১৯-এ ভারতের জনসংখ্যা ১৪১ কোটিতে পৌঁছানোর ইঙ্গিত দিয়েছিল যেটা ১৯৪৭-এর জনসংখ্যার ৪.৪ গুণ বেশি। তুলনামূলকভাবে চীনে ১৯৫০ সালের জনসংখ্যা ৫৫ কোটি ছিল কিন্তু সেখানে জন্মনিয়ন্ত্রণ নীতিতে ৭০ বছর পর চীনের জনসংখ্যা মাত্র ১৪২ কোটিতে পৌঁছেছে যেটা ১৯৫০-এর তুলনায় মাত্র ২.৫৮ গুণ বেশি। উল্লেখ্য যে চীনের মোট জমি ভারত থেকে ২.৯১ বেশি এবং ভারত পৃথিবীর মাত্র ২ শতাংশ ভূমি গ্রহণ করে পৃথিবীর ১৯ শতাংশ জনসংখ্যার বোঝা বইয়ে চলছে। ভারতবর্ষ যদি ন্যূনতম ১৫ বছরের জন্য পরিবার পরিকল্পনা আইন বাধ্যতামূলক করে তাহলে প্রাথকিভাবে কিছুটা জনসংখ্যার থাবা থেকে স্বস্তির অনুমান করা যায়।

**অসমের মডেল অনুসরণ করে উত্তরপ্রদেশ সরকারও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে একটু কঠোর হতে চলেছে। দেশের প্রত্যেক প্রান্তে এরকম জনসংখ্যা নীতি যতই কার্যকরী করা হবে ততই মঙ্গল। নতুবা সরকারি কোনো প্রকল্পই সার্বিকভাবে ফলপ্রসূ হবে না।**

সম্প্রতি বরিষ্ঠ আইনজীবী অশ্বিনী

উপাধ্যায়ের এক আবেদনে সুপ্রিমকোর্ট কেন্দ্র সরকারকে ভর্ৎসনা করে জবাব চায় যে, সংবিধানে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কানুন লাগু করার নীতি থাকলেও জনসংখ্যা বিস্ফোরণে সরকার কেন উপযুক্ত কোনো পদক্ষেপ নিতে সচেষ্ট হচ্ছে না! ২০১১ সালের শেষ আদমশুমারির হিসাব অনুযায়ী ভারতের মোট জনসংখ্যা ১২১ কোটির সামান্য উপরে ছিল কিন্তু ২০২১-এর আদমশুমারির আগেই বর্তমানে ভারতে ১২৫ কোটি মানুষের আধার পরিচয় বানিয়ে নিয়েছে, প্রায় ২৫ কোটি মানুষ এখনো আধার বানায়নি এবং কয়েক কোটি অবৈধ নাগরিক ভারতে বসবাস করছে। অর্থাৎ বর্তমানে আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যা প্রায় ১৫০ কোটির সংখ্যায় পৌঁছে চীনকে পেছনে ফেলে দিয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশের কৃষিযোগ্য জমি মাত্র ২ শতাংশ এবং বিশুদ্ধ পানীয় জল মাত্র ৪ শতাংশের পরিমাণ আছে। উল্লেখ্য যে তৎকালীন অটলবিহারী বাজপেয়ী সরকারের আমলে ১১ সদস্যের এক সংবিধান সমীক্ষা আয়োগ দুই বছরের কঠোর পরিশ্রমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণকল্পে সংবিধানে ৪৭(এ) অনুচ্ছেদ যুক্ত করতে এবং তৎক্ষণাৎ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ আইন বলবৎ করতে কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রস্তাব জানিয়েছিল। কিন্তু দিল্লিতে এরপর অনেক রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ঘটলেও, সংসদে অনেক ধারা যুক্ত এবং বিলুপ্ত হলেও আর কোনো কেন্দ্রীয় সরকার এখন পর্যন্ত জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণকল্পে পূর্ণরূপ ধারণ করতে পারেনি। অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছতিশগড়, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড ও হরিয়ানা সরকার পঞ্চায়েত প্রার্থীর সর্বোচ্চ দু' সন্তান সম্পর্কীয় আইন প্রণয়ন করলেও পরবর্তী সময়ে মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, হিমাচল প্রদেশ, হরিয়ানা সরকার আবার আইন সংশোধন করে তাদের রাজ্যে আইনটি বাতিল করে নেয়। হরিয়ানা বিধানসভা পঞ্চায়েত প্রার্থীর দু সন্তান সম্পর্কীয় সিদ্ধান্ত ২০০৫ সালে উঠিয়ে দেয়। The Rajasthan Various Services (Amendment) Rules 2001-এর মাধ্যমে রাজস্থান সরকার আইন প্রণয়ন করে যে ০১.০৬.২০০২ তারিখের পরে তৃতীয় সন্তান জন্ম নিলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সকল সরকারি চাকরি এবং পদোন্নতির ক্ষেত্রে অযোগ্য বিবেচনা করা হবে। The Amendment Rules 2001-এর সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে রাজস্থান উচ্চ ন্যায়ালয়ে DBCWP No. 18662/2012 অভিযোগ দাখিল করলে মহামান্য উত্তরাখণ্ড উচ্চ ন্যায়ালয় ১৭.০৯.২০১৯ তারিখে SAL No. 736/ 2019-এ রায়দান করে যে দু' সন্তানের অধিক সন্তান জন্ম দিলে সরকারি চাকরিতে প্রসবকালীন ছুটি মঞ্জুর করা হবে না। গত ২৫ জুন ২০১৯-এ উত্তরাখণ্ড পঞ্চায়েতি রাজ (সংশোধনী) বিল ২০১৯ রাজ্য বিধানসভায় বিরোধীদের প্রবল আপত্তি থাকা সত্ত্বেও পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রার্থীদের দু' সন্তানের নীতি ধ্বনি ভোটে পাশ হয়। পূর্বে অসমের বিধানসভায়ও ১৯৯৪ সনের পঞ্চায়েত আইন সংশোধন করে দু' সন্তানের নীতি কার্যকরী করা হয়। অসমের পঞ্চায়েত আইনের সূত্র ধরে Section 111(2) Assam Panchayat Act 1994 অনুসারে কাছাড় জেলার বড়খলা বিধানসভা কেন্দ্রের ভাঙ্গারপার জিপিতে কংগ্রেসের আঞ্চলিক পঞ্চায়েত সদস্য নার্গিসকে তিন সন্তানের জন্ম দেওয়ায় পদ থেকে অপসারিত করা হয়।

১৯৭৫ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে সম্পূর্ণ ভারতবর্ষে আপৎকালীন সময়ে সঞ্জয় গান্ধী জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে এক বন্ধ্যাত্বকরণ অভিযান চালান যেখানে সরকারি পুলিশ, কর্মকর্তাদের বাধ্যতামূলক এর আওতায় আনা হয়, গ্রাম-শহরে অনেক জবরদস্তি বন্ধ্যাত্বকরণ করার ফলে প্রায় ৬২ লক্ষ লোকের বন্ধ্যাত্বকরণ হয়ে যায় যার মিশ্র প্রভাবে পরবর্তী ১৯৭৭ সালের লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের ভারী হার হয়। তারপর 'পরিবার নিয়োজন' প্রকল্পের নাম বদলকরণে হয় 'পরিবার পরিকল্পনা' কোনো কেন্দ্রীয় সরকারই জ্বলন্ত এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার আর সাহস পায়নি। সম্প্রতি ৭৩তম স্বতন্ত্রতা দিবসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে দেশবাসীর কাছে ছোটো পরিবারের আহ্বান জানান এবং সেটাকে দেশভক্তির অন্যরূপ হিসাবেও বর্ণিত করেন। প্রধানমন্ত্রী দেশের জনসংখ্যা বিস্ফোরণে এতটাই চিন্তিত যে দেশের শিক্ষিত সমাজকে পরিবার জন্মনিয়ন্ত্রণে সজাগতার আকুল আবেদন জানান এবং ছোটো পরিবারের সফলতা তুলে ধরেন। কিন্তু ভারতবর্ষের বিশাল জনসংখ্যার একটি বিশেষ অংশ ধর্মান্ধতায় বিভোর ধর্মের কাছে শিক্ষাকে হার মানিয়ে ভোট ব্যবসায় সফল সওদাগর। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্য যে সংখ্যালঘু নেতা আসাদুদ্দিন ওয়েসির মতো উচ্চশিক্ষিত লোক দেশের জনসংখ্যা বিস্ফোরণকে সমর্থন করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী ও মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার আহ্বানকেও সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে হস্তক্ষেপ বলতে দ্বিধাবোধ করেন না, তাহলে আমরা কীভাবে কোনো ধর্মান্ধ অশিক্ষিত সমাজ থেকে কিছু আশা করতে পারি।

উল্লেখ্য যে ২০০১-২০১১ সাল পর্যন্ত মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২৪.৬ শতাংশ ছিল যা দেশের মোট জনসংখ্যার ১৪.২ শতাংশ কিন্তু সেটা ২০০১ সাল পর্যন্ত ১৩.৪ শতাংশ ছিল। অন্যদিকে হিন্দুদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ১৬.৮ শতাংশ যা গত দশকের তুলনায় ৩.২ শতাংশ কম। ভারতবর্ষের মতো ধর্ম নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক দেশে যেখানে ধর্মীয় গোঁড়ামির জন্য জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে অসফল সেখানে আমাদের প্রতিবেশী ইসলামিক দেশ পাকিস্তান ২০২৫ পর্যন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৫ শতাংশের নীচে রাখার টার্গেট রেখেছে। বাংলাদেশে ১৯৭৫ সালে সক্ষম দম্পতির প্রায় ৮ শতাংশ জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করতেন। সেই সংখ্যা এখন ৬৩.১ শতাংশে অর্থাৎ বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এখন মাত্র ২ শতাংশের একটু উপরে। উল্লেখ্য যে সেখানকার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি শিক্ষা বিভাগ, এমনকী মাদ্রাসায়ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণকল্পে জোর সজাগতা অভিযান চালানো হয়ে থাকে এবং সেটা বিনা বিতর্কে। কিন্তু আমাদের দেশের এমন দুর্ভাগ্য যে সরকারের প্রত্যেকটি সুপরিকল্পনাকে ধর্মের গোঁড়ামির বিতর্কের চাদরে ঢেকে দেওয়ার যেন এক অঘোষিত প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। সাম্প্রতিককালে অসমের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নীতিতে বিরোধী মহাজোট কংগ্রেস-এআইইউডিএফ এক সুরে প্রতিবাদ করছে। তবে দেশের বিরোধীরা যখন বিশেষ এক ধর্মীয় গোষ্ঠীর প্রতি দুর্বল হয়ে যায় তখন দেশের অভিভাবকদের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে তো সাহসী কোনো পদক্ষেপ নিতেই হবে। অসমের মডেল অনুসরণ করে উত্তরপ্রদেশ সরকারও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে একটু কঠোর হতে চলেছে, দেশের প্রত্যেক প্রান্তে এরকম জনসংখ্যা নীতি যতই কার্যকরী করা হবে ততই মঙ্গল নতুবা সরকারি কোনো প্রকল্পই সার্বিকভাবে ফলপ্রসূ হবে না। ▯

# সাভারকর না থাকলে সুভাষ ‘নেতাজী’ হতেন না

**ডাঃ আর এন দাস**

কংগ্রেস ও সাভারকরের সম্পর্ক যেন ‘সাপে-নেউলে’। ভারতের স্বাধীনতা লাভের বিষয়ে, গত ৭৩ বছর ধরে শেখানো হয়েছে, ‘বিনা খড়্গ, বিনা ঢাল; সাবরমতি কে সন্ত নে কিয়া কামাল’। আসল ইতিহাসটিকে জানতে দেওয়া হয়নি। স্কুল-কলেজের পাঠ্যপুস্তকে সেসব বীর সেনানীদের কাহিনি, যাঁদের আমরণ সংগ্রামের জন্যই ইংরেজকে ভারত ছাড়তে হয়েছিল, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবেই সেটা জানানো হয়নি। মর্মান্তিক এই নাটকের খলনায়ক ছিল কংগ্রেস ও কমিউনিস্টরা।

কংগ্রেস পার্টি সৃষ্টির ইতিহাস দিয়েই শুরু করা যাক। স্কটল্যান্ডনিবাসী আল্যান অকটাভিয়ান হিউম নামে এক ধূর্ত ব্রিটিশ, ১৮৪৯ সালে ভারতে আসেন ইম্পিরিয়াল সিভিল সার্ভেন্ট হিসেবে। ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম ১৮৫৭-এর সময় তিনি উত্তরপ্রদেশের ‘ইটাওয়াতে’ ইংরেজ সেনার পদস্থ অফিসার ছিলেন। চতুর হিউম বুঝেছিলেন, স্বতঃস্ফূর্ত সেই সংগ্রাম ও জনরোষের অগ্নিশিখা শীঘ্রই দাবানলের মতো চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়বে। তৎকালীন ভারতের ভাইসরয় দ্য আর্ল অব ডাফরিনের পরামর্শে, ১৮৮৫ সালে বোম্বেতে তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম সম্মেলনে ইংরেজ ছাড়াও ভারতীয় সমাজের অনেক রাজা-মহারাজা, প্রতিষ্ঠিত ও প্রভাবশালী ব্যক্তিকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে সদস্যপদ দেওয়া হয় যাতে তারা নিপীড়িত জনগণের রোষ প্রশমিত করতে পারে। বিশিষ্টদের মধ্যে ছিলেন ধর্মান্তরিত প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি, জাস্টিস রানাডে, বদরুদ্দিন তাইয়েবজি, ফিরোজ শাহ মেহতা ও দাদাভাই নওরোজি। এটা ছিল সম্পন্ন ব্যক্তিদের সান্ধ্যকালীন বৈঠকখানা। সভায় বিতর্কের বিষয় নিপীড়িত জনতার করুণ আকুতির কথা নয়, বরং কীভাবে ভারতে ইংরেজ শাসন আরও মজবুত করা যায় এবং ১৮৫৭ সালের দাবানলের পুনরাবৃত্তি যাতে আর না ঘটে তারই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা।

দেশভক্তরা শ্রদ্ধার সঙ্গে যখন সাভারকরের ১৩৭তম জন্মজয়ন্তী পালন করছেন, সেসময় কংগ্রেস-কমিউনিস্টরা সম্মিলিত ভাবে তাঁর বিরোধিতা করছেন। সম্প্রতি লোকসভায় সাভারকরকে মরণোত্তর ভারতরত্ন উপাধি দেওয়ার প্রস্তাবে কংগ্রেসের তাবড় নেতাদের

বিরোধিতা লক্ষণীয় ছিল। ইতিহাসকার ডাঃ বিক্রম সম্পতের লেখা 'ইকোস ফ্রম দ্য ফরগটন পাস্ট' নামক গবেষণাগ্রন্থ থেকে জানা যায়, 'ইংরেজ সরকার কংগ্রেসকে তাদের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছিল। কংগ্রেস ব্রিটিশের বিরোধিতা করে স্বাধীনতা চায়নি বরং ইংল্যান্ডেশ্বরের অধীনতা স্বীকার করে বেঁচে থাকার অধিকার চেয়েছিল। ইংরেজরা জানতো সহযোগী কংগ্রেস থেকে তাদের কোনো বিপদ নেই। বিপদ আসবে বিপ্লবীদের কাছ থেকে। তাই কংগ্রেসকে লাগাতে হবে এই বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে। 'বিভাজন আর কুশাসন'-এর নীতি তারা অতি চাতুর্যের সঙ্গে ২০০ বছর ধরে ভারতে তথা সারাবিশ্বের উপনিবেশগুলিতে চালিয়ে এসেছিল। সাভারকরের মতো বিপ্লবীরা এই শয়তানি অনেক আগেই বুঝেছিলেন। তাই কংগ্রেসের বিকল্প রাজনৈতিক সংগঠন ও সেনাদল গঠনের প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। সাভারকরই প্রথম ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং মৃত সৈনিকদের বীরগতি প্রাপ্তের সম্মান দিয়েছিলেন। লন্ডনে আইন পড়ার সময়ে ১৯০৬ সালে ইন্ডিয়া হাউসে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর সঙ্গে ১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের ৫০তম বর্ষ উদ্‌যাপন বিষয়ে সাভারকরের ঘোরতর মতান্তর হয়। তাতে গান্ধী তাকে সমর্থনের পরিবর্তে ভীতিপ্রদর্শন করেন। সাভারকর তখন মাদাম ভিকাজি কামা, শ্যামজীকৃষ্ণ বর্মা, মদনলাল ধিংড়া, লালা হরদয়াল, বীরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি-সহ অন্যান্য অনেক বিপ্লবীর সঙ্গে ১৯০৭ সালে তিলক হাউসে সেই উৎসব উদ্‌যাপন করেন। তিনি গান্ধীর কড়া সমালোচনা করে বলেছিলেন, 'ইংরেজরা কংগ্রেসকে নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করছে'। স্বাভাবিকভাবেই সাভারকর শীঘ্রই ইংরেজ শাসক ও তাঁবেদার কংগ্রেসের কুনজরে পড়েছিলেন। সেকারণেই গান্ধী-নেহরু ও তাদের সহগামীরা কোনোদিনও সুভাষ বা সাভারকরের মুক্তি বা তাদের পক্ষে সমর্থন জানায়নি বরং তাদের ইংরেজদের হাতে সঁপে দিয়ে পথের কাঁটা দূর করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। কংগ্রেসের ৫৮ বছরের রাজত্বকালে সুভাষ-সাভারকরদের মতো ক্রান্তিকারীদের সম্মান তো দূরের কথা, ভারতীয় জনমানস থেকে মুছে ফেলার জন্য নিরন্তর প্রয়াস চালানো হয়েছে। হিউম কংগ্রেসের সৃষ্টি করেছিলেন ভারতে ব্রিটিশ শাসন সুদৃঢ় করার জন্য। পরে সেটা গান্ধীর নিজস্ব পার্টি হয়ে যায়। নেহরু সেটাকে স্বীয় স্বার্থপূর্তির পার্টি করেন। পরবর্তীকালে ক্ষমতাসীন সত্তাধারীরা কংগ্রেসকে কামধেনুর মতো ব্যবহার করে গেছেন গত ৭৩ বছর ধরে। গান্ধী চেয়েছিলেন স্বাধীনতার পর কংগ্রেসের বিলুপ্তি হোক কিন্তু আজও বংশবাদের অংশ হিসেবে তাকে জিইয়ে রাখা হয়েছে কার্তি চিদাম্বরন, এম.কে. স্ট্যালিন, রাহুল গান্ধী, অখিলেশ বা লালু যাদবদের স্বার্থ রক্ষার জন্য। সাভারকরের ১৯৬৬ সালে দেহাবসানে ইন্দিরা গান্ধী তাঁকে বীর ও দেশপ্রেমিক যোদ্ধা হিসেবে সম্মান দেখিয়ে ডাকটিকিট, তথ্যচিত্র ও স্মৃতিফলকের উদ্‌ঘাটন করেছিলেন। কিন্তু তাঁরই বংশধর কংগ্রেস-সভাপতি 'রাহুল ভিঞ্চি' এখন সাভারকর সম্বন্ধে অশ্লীল মন্তব্য করতে সাহস পাচ্ছেন।

গান্ধীর পূর্বে ১৯০৫ সালে সাভারকরই প্রথম পুনাতে বিদেশি কাপড় দহন ও বর্জনের আন্দোলন করেন। ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অভিযোগে ১৯১০-১৯৩৮ সাল সাভারকরই একমাত্র বিপ্লবী যিনি ১০ বছরের 'কালাপানি'র শাস্তি-সহ ২৭ বছর ব্রিটিশ জেলে নিদারুণ যাতনা সহ্য করেছিলেন। আন্দামানে তৈরি সূর্যালোকবিহীন ছোট্ট কালকুঠরিতে ঢুকিয়ে দেওয়া হতো যাতে 'অস্টিওম্যালাসিয়া' নামক হাড়ের রোগে বন্দিরা মারা যায়। কলুর বলদের মতো ঘানিতে জুড়ে দিয়ে প্রতিদিন ১৩.৫ সের সরষের তেল তৈরি করানো হতো। অক্ষম বন্দিদের লোহার বেড়িতে বেঁধে নৃশংসভাবে বেত্রাঘাত, অনাহারে রেখে দৈহিক ও মনোবল কমিয়ে ইংরেজের কাছে নিঃশর্তে আত্মসমর্পণ করানো হতো। সাভারকরকে এমন কুঠরিতে রাখা হয়েছিল যেখান থেকে প্রতিদিন সূর্যোদয়ের সময় ক্রান্তিকারীদের ফাঁসি দেওয়া বা প্রকাশ্য দিবালোকে হাত-পা বাঁধা বিপ্লবীদের উপর নিদারুণ নির্যাতনের দৃশ্য দেখানো যায়। ইংরেজরা নিষ্ঠুর পাঠান রক্ষীদের দ্বারাই এসব করাতো। লোহার বেড়িতে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় শৌচক্রিয়া করানো হতো। সীমিত পরিমাণ সমুদ্রের লবণাক্ত জল দেওয়া হতো। সাভারকর ১০ বছর দেওয়ালকে কাগজের মতো ব্যবহার করে পাথর, কাঠকয়লা বা নখকে কলম বানিয়ে ৮-১০ হাজার কবিতার স্তবক লিখেছিলেন। যাতে হাতের কাছে এক টুকরো কাগজ বা কলম না পান তার জন্য জেল-কর্তারা অত্যন্ত যত্নশীল থাকতেন। একই সময়ে লখনউ বা আলিপুরে জেলবন্দি নেহরু একাধিক ইংরেজি ও হিন্দি পত্রপত্রিকায় দেশ-বিদেশের খবারখবর, ব্রিটিশদের শৌর্য ও শঠতার কাহিনি পড়তে পেতেন। নেহরু সকালের জলখাবার এবং দুপুর আর রাতের খাবারের আমিষ ও নিরামিষ মেনু নিজেই ঠিক করতে পারার স্বাধীনতা পেয়েছিলেন। জেলে ধূমপান নিষিদ্ধ হলেও নেশাগ্রস্ত নেহরু জেলারের বিশেষ অনুগ্রহ পেয়েছিলেন। জেলের মধ্যে তাঁর নিজস্ব পাচকও ছিল মনমতো খাদ্য তৈরির জন্য। সে যুগে ব্রিটিশের জেলবন্দি স্বাধীনতা সংগ্রামীকে কেন এমন বিশেষ সুযোগসুবিধা দেওয়া হয়েছিল সেটা বুদ্ধিমান পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হবে না। হিন্দুদের সবচেয়ে বড়ো রোগ হচ্ছে জাতিপ্রথা। গীতায় আছে, 'চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম বিভাগশঃ'। কিন্তু কালের প্রবাহে আর বিদেশি আক্রমনকারীদের কুটিল কুশাসনের ফলে সেটা জন্মগত ও বর্ণগত হয়ে পড়েছিল। সাভারকর

জাতিভেদ প্রথা দূর করার প্রয়াস আমরণ চালিয়ে যান। বিদেশিদের 'বিভাজন আর কুশাসনের' পরিণতি ও পরিণাম, সহস্র বছরের পরাধীনতার গ্লানির ইতিহাস তিনি সঠিক ভাবে অনুধাবন করেছিলেন। সমস্ত হিন্দু সমাজকে একই সূত্রে বাঁধার নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে গেছিলেন সাভারকর। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল সাভারকরের লেখা 'দ্য ইন্ডিয়ান ওয়র অব ইন্ডিপেন্ডেন্স-১৮৫৭' বইটিকে 'নিরুৎসাহীদের প্রেরণার স্রোত' বলে ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। সাভারকরের যে বইগুলি যুবকদের আশা ও অনুপ্রেরণার দীপশিখা প্রজ্বলিত করতে পারতো, ব্রিটিশ শাসকরা এমনকী স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৮ বছর পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯৫০ সাল পর্যন্ত তৎকালীন কংগ্রেসি সরকার ভারতীয় জনমানস থেকে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই সেগুলিকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। সম্প্রতি গুজরাট-মহারাষ্ট্র সীমানায় পালঘরে হিন্দুসাধু হত্যা, বিশ্বজনীন 'গায়ত্রী পরিবারের' প্রধান ড. প্রণব পাণ্ডিয়ার বিরুদ্ধে মহিলার শ্লীলতাহানির মামলা ইত্যাদি হিন্দুবিরোধী ষড়যন্ত্র— একথাই মনে করিয়ে দেয় যে, হিন্দুর জাতীয়তাবোধের জনক সাভারকরের স্মৃতিকে ম্লান করে দেওয়ার সুপরিকল্পিত চক্রান্ত কেন করা হয়! ১৯৪৭ সালে ইংরেজরা ক্ষমতা হস্তান্তর করেছিল যাদের সঙ্গে আজ স্বাধীন ভারতে প্রতিদিন তারাই এসব নষ্টামির নায়ক। সেই বীরবিপ্লবীর সংঘর্ষের কাহিনি এবং তাঁর জীবনী সাহিত্যের প্রকাশন প্রয়াত যশস্বী প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী ও স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদের একক প্রচেষ্টায় কিছুটা হলেও সম্ভব হয়েছিল। সেলুলার জেলের যাতনা সহ্য করতে না পেরে অনেক বিপ্লবী আত্মহত্যা বা অনশনের পথ বেছে নিয়েছিলেন কিন্তু বীর সাভারকর এভাবে জীবননাশের বিপক্ষে ছিলেন। প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, জীবিত থেকে এবং জেল থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত স্বাধীনতার জন্য লড়াই চালিয়ে যাবেন। সুভাষের মতোই অসমসাহসী সাভারকর ১৯১০ সালের ৮ জুলাই সেলুলার জেল থেকে সাঁতর কেটে বঙ্গোপসাগর পার হয়ে মারসাইল দ্বীপে পালাতে সমর্থ হয়েছিলেন। অবশ্য পরে আবার ধরা পড়েন। সেসময় জেলবন্দি সাভারকরের উপর যে পরিমাণ অত্যাচার করা হয়েছিল তার সিকি ভাগও অন্য কোনো কংগ্রেসি নেতাকে সহ্য করতে হয়নি। যাঁদের জন্য ব্রিটিশকে ভারত ছাড়তে হয়েছিল, সেই বীরেরা বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছেন কিন্তু নিজেদের আখের গোছাতে এবং লাভের গুড়ের ভাগবাঁটোয়ারায় ব্যস্ত থাকা, সুবিধাবাদী তথাকথিত নেতারা আজ খ্যাতির ছটায় আলোকিত। আজও তাদের নামে ঘটা করে জন্মজয়ন্তী পালিত হয়। রাস্তাঘাট, পার্ক, এয়ারপোর্ট ও হাজারটা যোজনার নামকরণের মাধ্যমে তাদের দেশদ্রোহিতার স্মৃতিকে জাগরুক রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

অন্যদিকে যারা বীরের মতো ব্রিটিশের অধীনতা অস্বীকার করে জীবনাহুতি দিয়েছিলেন তাদের জোর করে গত ৭৩ বছর ধরে তথাকথিত বামপন্থী বুদ্ধিজীবী, ইতিহাসকার ও সদাসত্যের সন্ধানী সাংবাদিকরা মানুষের মন থেকে মুছে ফেলার এবং সবরকম শঠতার সাহায্যে মিথ্যার মোড়কে সত্যের অপলাপ করে চলেছেন। মোদীর নেতৃত্বে ২০১৪ সাল থেকে প্রথমবারের মতো ইতিহাসকে বিকৃত করার অপচেষ্টার প্রতিবাদ করা হচ্ছে। আজ রাজনীতির গলিগলিতে মত্তমাতঙ্গের মতো বিচরণশীল চিদাম্বরম, দিগ্‌বিজয়, লালুপ্রসাদ ও রাহুলের মতো দেশদ্রোহীদের প্রকৃত বিচারের আশায় দিন গুনছে ভারতবাসী। প্রয়াত ভারতরত্ন অটলজীর কথায়, 'সাভারকর মানে তেজ, ত্যাগ, তপ, তত্ত্ব, তর্ক, তির ও তলোয়ার। সাভারকর মানে তারুণ্য ও তিলমিলাহট, তিতিক্ষা ও তিখাপন'। ১৯৪৬ সালের ২২ জুন নেতাজী সুভাষ সাভারকরের বাড়িতে সাক্ষাৎ করেন এবং তিন ঘণ্টার বিস্তৃত আলোচনায় সুভাষের দেশান্তরে পাড়ি জমানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিদেশি ও ভারতীয় সৈন্যশক্তির সাহায্যে ভারত থেকে ব্রিটিশদের উৎখাতের পরিকল্পনা করা হয়। 'শত্রুর শত্রু আমার মিত্র'— এই ছিল সে সময়ের রণনীতি। ১৯৪১ সাল, রাত দেড়টা। এলগিন রোডের বাড়ি থেকে ব্রিটিশ গোয়েন্দার চোখে ধুলো দিয়ে, কাবুল হয়ে জার্মানিতে পৌঁছে যান অসমসাহসী এই বাঙ্গালি বীর। দু' বছরে মধ্যে ৬০ হাজার সেনার 'আজাদ হিন্দ ফৌজের' সর্বাধিনায়ক।

'দ্য এপিক সুইপ অব ডি.ভি. সাভারকরের' লেখক ইতিহাসকার হরীন্দ্র শ্রীবাস্তবের কথায়, 'যারা আজ সাভারকর ও সুভাষের মূর্তি ভাঙছে বা কালি মাখাচ্ছে, তারা পশুর সমান'। স্বাতন্ত্র্যবীর সাভারকর ছিলেন একাধারে ঔপন্যাসিক, কবি, ক্রান্তিকারী, সমাজ-সংস্কারক, দার্শনিক ও দেশমাতৃকার অসমসাহসী সেনানীদের অন্যতম সন্তান। ইংরেজি ও মারাঠিতে লেখা, 'হিন্দুত্বঃ হিন্দু কে', 'কালাপানি', 'মাঝা জন্মথেপ', 'অনাদি মা অনন্ত মা', 'রণসিং', 'সংগীত উত্তরক্রিয়া', 'মোপলা বিদ্রোহ' প্রভৃতি ৩৮টি পুস্তক--- সাভারকরের বহুমুখী প্রতিভার জ্বলন্ত স্বাক্ষর।

## শোকসংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শুভানুধ্যায়ী ও স্বস্তিকা পত্রিকার একনিষ্ঠ পাঠক তাপস দত্ত গত ২৪ এপ্রিল ৮৪ বছর বয়সে কলকাতার বৈষ্ণবঘাটা পাটুলির বাড়িতে পরলোকগমন করেন।

তিনি ইনস্টিটিউট অব কেমিক্যাল বায়োলজি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক ছিলেন।

এছাড়া তিনি বিজ্ঞান ভারতী ও ভারতী বিদ্যামন্দিরের দায়িত্ব পালন করেছেন।

# স্মৃতিপটে বারবার বীর সাভারকর

**সৌমিত্র সেন**

২৮ মে, ভারতের মুক্তিযোদ্ধা বিনায়ক দামোদর সাভারকর (বীর সাভারকর)-এর জন্মবার্ষিকীতে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাই। তিনি ছিলেন একজন ভারতীয় স্বাধীনতা কর্মী, রাজনীতিবিদ, আইনজীবী এবং লেখক। তিনি স্বাতন্ত্র্য বীর সাভারকর নামেও পরিচিত।

**গুরুত্বপূর্ণ দিক :**

**জন্ম :** বীর সাভারকর ১৮৮৮ সালের ২৮ মে মহারাষ্ট্রের নাসিকের কাছে ভাগুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা, রাজনীতিবিদ, আইনজীবী, লেখক, সমাজ সংস্কারক এবং হিন্দুত্ব দর্শনের সুত্রকারক ছিলেন। সাভারকর হিন্দুত্ববাদী আদর্শের জন্য পরিচিত। তিনি যখন তার গ্রামে আক্রমণ করার জন্য একদল মুসলমানের বিরুদ্ধে ছাত্রদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তখন বয়স মাত্র ১২ বছর আর তাই তিনি 'বীর' ডাকনাম অর্জন করেছিলেন।

**সম্পর্কিত সংস্থা ও কাজ :**

'অভিনব ভারত সোসাইটি' নামে একটি গোপন সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ব্রিটিশ যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলেন এবং 'ইন্ডিয়া হাউস এবং ফ্রি ইন্ডিয়া সোসাইটি'র মতো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তিনি 'হিন্দু মহাসভা' গঠনের সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। তিনি ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত হিন্দু মহাসভার সভাপতি ছিলেন। সাভারকর 'The History of the War of Indian Independence' শীর্ষক একটি বই লিখেছিলেন যাতে তিনি গেরিলা যুদ্ধের কৌশল সম্পর্কে বহুমূল্য তথ্যসমৃদ্ধ লেখা লিখেছিলেন। তিনি 'হিন্দুত্ব : কে হিন্দু?' বই লিখেন।

**বিচার ও শাস্তি :**

১৯০৯ সালে 'মর্লে-মিন্টো সংস্কার' (ভারতীয় কাউন্সিল আইন ১৯০৯)-এর বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহের ষড়যন্ত্রের অভিযোগে সাভারকরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। বিপ্লবী গোষ্ঠী 'ইন্ডিয়া হাউসে'র সঙ্গে যোগাযোগের জন্য ১৯১০ সালে তিনি আবারও গ্রেপ্তার হন।

সাভারকরের বিরুদ্ধে অন্যতম অভিযোগ ছিল নাসিকের কালেক্টর জ্যাকসনকে হত্যার পরিকল্পনার সঙ্গে জড়িত থাকার জন্য এবং দ্বিতীয়টি ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২১-এ এর অধীনে ষড়যন্ত্র চালানোর অপরাধে।

দুটি বিচারের পরে সাভারকরকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং ৫০ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় যা 'কালাপানি' নামে অধিক পরিচিত। তাঁকে ১৯১১ সালে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের সেলুলার কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। তাকে ব্রিটিশ সরকার রাজনৈতিক বন্দি হিসেবে বিবেচনা করেনি।

**মৃত্যু :** ১৯৬৬ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি তিনি অনশনে স্বেচ্ছা মৃত্যু বরণ করেন।

**অভিনব ভারত সোসাইটি**
**(ইয়ং ইন্ডিয়া সোসাইটি)**

এটি ১৯০৪ সালে বিনায়ক দামোদর সাভারকর এবং তাঁর ভাই গণেশ দামোদর সাভারকর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি গোপন সমিতি।

প্রাথমিকভাবে মিত্র মেলা হিসেবে নাসিকে প্রতিষ্ঠিত

এই সংস্থাটি ভারত এবং লন্ডনের বিভিন্ন অঞ্চলে কিছু শাখা-সহ বেশ কয়েকজন বিপ্লবী ও রাজনৈতিক কর্মীদের সঙ্গে যুক্ত ছিল।

**ইন্ডিয়া হাউস :**

এটি ১৯০৫ সালে লন্ডনে শ্যামজী কৃষ্ণ বর্মা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

এটি লন্ডনে ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রচারের জন্য খোলা হয়েছিল।

**ফ্রি ইন্ডিয়া সোসাইটি :**

এটি ব্রিটিশ শাসন থেকে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ইংল্যান্ডের ভারতীয় ছাত্রদের একটি রাজনৈতিক সগঠন ছিল।

প্রাথমিকভাবে একটি বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী, এটি তার প্রতিষ্ঠাতা নেত্রী ম্যাডাম ভিকাজি কামার অধীনে একটি বিপ্লবী সংগঠনে পরিণত হয়েছিল।

**হিন্দু মহাসভা :**

এটি ১৯৩৩ সালে গঠিত একটি রাজনৈতিক দল ছিল। এটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বীর দামোদর সাভারকর, লালা লাজপত রায়, মদনমোহন মালব্য প্রমুখ। ১৯০৬ সালে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লিগ গঠনের পরে এবং ব্রিটিশ ভারত সরকার ১৯০৯-এর মর্লে-মিন্টোর সংস্কারের অধীনে পৃথক মুসলিম ভোটার গঠনের পরে, হিন্দুদের অধিকার রক্ষার জন্য এই সংস্থাটি গঠন করা হয়েছিল।

১৯১৯ সালের ডিসেম্বরে জারি করা রাজকীয় ঘোষণার কথা উল্লেখ করে যা সাভারকর ভাইদের বাদে অনেক রাজনৈতিক বন্দিকে মুক্তি দেয়। গান্ধী ইয়ং ইন্ডিয়াতে ২৬ মে লিখেছিলেন (মহাত্মা গান্ধী : সংগৃহীত কাজ, ই-বুক, প্রকাশনা বিভাগ, জিওআই, খণ্ড ২০, পৃষ্ঠা-৩৬৮-৩৭১)। “ভারত সরকার এবং প্রাদেশিক সরকারগুলির পদক্ষেপের জন্য ধন্যবাদ, যারা সেই সময় কারাগারে ছিলেন তাদের মধ্যে অনেকেই রয়েল ক্লিনেন্সির সুবিধা পেয়েছেন। তবে কিছু উল্লেখযোগ্য ‘রাজনৈতিক অপরাধী’ আছেন যারা এখনও অব্যাহতিপ্রাপ্ত হননি। এর মধ্যে আমি সাভারকর ভাইদের গণনা করি।

“তারা পুরুষ হিসাবে একই অর্থে রাজনৈতিক অপরাধী, উদাহরণস্বরূপ, যাদের পঞ্জাবে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। এবং ঘোষিত প্রকাশের পাঁচ মাস পেরিয়ে গেলেও এই দুই ভাই তাদের স্বাধীনতা পাননি।” ◻

*With Best Compliments*
*from :-*

**A**
**Well Wisher**

# ‘দিশি’ পত্রিকার একমুখী হিন্দু বিদ্বেষ

**সুদীপ নারায়ণ ঘোষ**

একেক সময়ে ধাঁধাঁ লাগে বাঙ্গলার বুদ্ধিজীবীরা আমাদের সম্পদ না দায়! এই কথা বলতে হচ্ছে কারণ বাঙ্গলার তথাকথিত শিল্প, সাহিত্য ও বৌদ্ধিক কাজে যুক্ত ব্যক্তিরা বাঙ্গলার অধঃপতনের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। এই ব্যাপারে তাঁদের সহযাত্রী এখানকার মাধ্যম— বৈদ্যুতিন ও মুদ্রণ উভয়ই। একটি দিশি পত্রিকা যে নিজেকে বাঙ্গলা সংস্কৃতির ধারকবাহক বলে জাহির করে তার সম্পাদকীয় থেকে শেষ পাতা পর্যন্ত হিন্দুদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে চলেছে। এখানে কিছু নমুনা-সহ জবাব দেওয়ার চেষ্টা করব।

কবি শঙ্খ ঘোষের প্রয়াণ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত বিশেষ সংখ্যায় সম্পাদকীয়তে এর নান্দীমুখ আছে— ‘‘এমন একটা কঠিন সময়ে কবি প্রয়াত হলেন সে সময় বড়ো নিষ্ঠুর। নির্ভীক স্পষ্টবাদিতার প্রয়োজনীয়তা আজ আরও বেশি মাত্রায় অনুভূত। নির্মমভাবে জাতি এবং সমাজের সমীক্ষা করতে সমর্থ হলে স্পষ্টবাদী হওয়া সম্ভব। প্রাতিষ্ঠানিকতার বিরুদ্ধে সরব হওয়া যায়। শঙ্খবাবু দুটোই করতে পেরেছিলেন।’’ এখানে নিশানা যে ২০১৪ থেকে প্রারম্ভিত কেন্দ্রীয় সরকার তথা নিরীহ হিন্দুরা তা স্পষ্ট হবে পরের অনুচ্ছেদে।

সম্পাদক মহাশয় এতে ক্ষান্ত না হয়ে তার পরের পৃষ্ঠায় স্বতন্ত্র নিবন্ধে লিখেছেন সরাসরি সে কথা। ভোটের সূচনা পর্বে যে কুখ্যাত খেলার কথা কেউ বলেছিলেন তাতে সব সংবাদমাধ্যম সমর্থন জানিয়েছিল; ফল ঘোষণার পরেই কংগ্রেস-কমিউনিস্ট দলের বিজয় উৎসব পালনের মধ্য দিয়ে তা প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এই দিশি পত্রিকা যে তাদের জুড়িদার ছিল তা তিনি খুল্লমখুল্লা বলেছেন। বিশ্ববাংলাখ্যাত মুখ্যমন্ত্রীর বন্দনাগান এইভাবে করা হয়েছে, ‘‘...নিজের মনুষ্যসত্তার যাবতীয় স্বাভাবিক দুর্বলতাকে তিনি অগ্রাহ্য করার সাহস দেখিয়েছেন’’— প্রশ্ন কীভাবে? উত্তরটা সবার জানা। আরও বলা হয়েছে ‘‘আর তার উপরে প্রতিষ্ঠিত করেছেন নিজের ইচ্ছাশক্তি আর প্রবল কর্মোদ্যমকে। নির্বাচন শেষে দেখা গেল তাই তাঁকে অজেয় করে তুলেছে।’’ —মিথ্যা কথা।

এর পর লিখেছেন, ‘‘তিনি কেতাদুরস্ত সাহেবি উচ্চারণে ইংরেজি বলেননি, অভিজাত তথা ধনীদের সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেঁষি করেননি... তাঁর লক্ষ্য নিজেকে সমাজের একেবারে অন্ত্যজতমের কাছে নিয়ে যাওয়া (!) কিন্তু এটা কী করে সম্ভব হলো? একাজে তো রাজনীতির মানুষজন অনেক দড়। দাওয়ায় আসন পেতে আহার্যগ্রহণ, শত ফ্ল্যাশবাল্ব, টিভি ক্যামেরা আর মিডিয়ার মানুষজনের সম্মুখে। না তাঁকে এসব করতে হয়নি। তাঁকে দরদির বর্ম পরে কারও চৌকাঠ ডিঙোতে হয়নি’’ নেত্রী কি রাজনীতির বাইরের লোক? সম্পাদক মহাশয় যে পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত সেই গোষ্ঠীর বাজারি পত্রিকাতে ওই নেত্রীর অজস্র কুকীর্তির নথি সংরক্ষিত আছে আমাদের কাছে। ণত্ব-ষত্ব জ্ঞান থাকলে এসব লেখা যায় না। স্থানাভাবে সব উদ্ধৃত করছি না।

আরও আছে, চলিষ্ণুতার সঙ্গে সহিষ্ণুতার অঙ্গীকারের কথা তিনি বলেছেন কিন্তু ভোট-পরবর্তী একতরফা হিন্দুবিরোধী সন্ত্রাস যে তার সঙ্গে মিলছে না। তিনি যখন এটা লিখছেন তখন কিন্তু বেশ কয়েকজন হিন্দু নেত্রীর পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলমানদের হাতে নিহত/আহত হয়েছেন। বাঙ্গালি ক’প্রকার— এরকম একটা বিভাজন তৈরির চেষ্টা নাকি কিছু কম হয়নি! সম্পাদক তাঁর প্রমাণ দিতে পারবেন না। আমরা নিশ্চিত। সম্পাদক মহাশয় উলটো কথা বলছেন, বাঙ্গালি ও বহিরাগত তত্ত্ব কার আবিষ্কার? তিনি শেষে যা বলছেন তা যে মোদীজী এবং অমিতজীকে লক্ষ্য করে তা আর লুকোতে পারেননি, ‘‘দুজন এর হোতা ছিলেন। একজন স্বয়ং দিল্লিশ্বর এবং দ্বিতীয়জন তাঁর যোগ্য ডেপুটি! ...সুখের কথা, বিভাজনের রাজনীতি দিয়ে বাঙ্গালির মগজধোলাইয়ের ফন্দি মাঠে মারা গেছে। ...বাঙ্গালির শরীরে জ্বালা ধরলেও সে প্রতিশোধস্পৃহা দেখায়নি, নীরবে জবাব দিয়েছে। ইভিএমে।’’ এই তো হাটে হাঁড়ি ভেঙেছে।

হিন্দুদের ভোট দেওয়া থেকে বিরত করতে করোনা বা তার দ্বিতীয় ঢেউ নিয়ে মিথ্যা রটিয়ে দেওয়া হলো একেবারে নির্বাচনের মুখে। এই পত্রিকা কীভাবে তা করল দেখুন। সম্পাদক মহাশয়ের পরের নিবন্ধে লেখা হলো, ‘‘যে ব্যক্তিকে দেখেছিল এক লহমার ঘোষণায় হাজার হাজার মানুষকে লকডাউনের নামে ভিনপ্রদেশের অনিশ্চয়তায় ফেলে রাখতে, যিনি ওই শ্রমিকদের শিশুসন্তান আর পরিবার-সহ কয়েকশো কিলোমিটার হেঁটে যেতে বাধ্য করেছেন এবং প্রাণ হারাতেও। সেই তিনিই, সংক্রমণের আগুন যখন আগের চেয়েও লেলিহান, কয়েক লক্ষ বে-মাস্ক মানুষকে জড়ো করতে

পেরেছেন বলে আরও শুভ্র সমুজ্জ্বল হয়েছেন। কুম্ভ মেলায় লক্ষ লক্ষ মানুষকে একত্র হতে দেখেছি"। এসবের উত্তর দেওয়ার আগে আরও কয়েকটি উদাহরণ দিই।

এই সংখ্যায় শুরু হওয়া একটি উপন্যাসে সরাসরি সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নিয়ে কটাক্ষ করা হয়েছে এবং অবৈধ অনুপ্রবেশকে বাহবা দেওয়া হয়েছে। লেখা পরিষ্কার, এ এক আন্তর্জাতিক খেলা। ''দুমুখো সরীসৃপের মতো সারা গায়ে আঁশকাঁটা সাজিয়ে ধীরে ধীরে বেড়ে চলেছে নিজেরই অন্য মুখের সন্ধানে।" ইঙ্গিতগুলো সতর্ক পাঠকের বুঝতে অসুবিধে নেই। ''...মানুষ...ঝাঁকের মতো এসে ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে তার আঁশকাঁটার ওপর।"

যে কবিনামধারী সুবোধ বালক কমিউনিস্ট পার্টি ছেড়ে তৃণমূলে এসেছিলেন যেহেতু তাঁর স্ত্রীর চিকিৎসায় সেই সরকার যথোচিত সাহায্য করেননি, তিনি লিখছেন, ''২০১৭ সালে দিল্লিতে ভারতের সর্বোচ্চ সাহিত্য পুরস্কারটি গ্রহণ করে আসল কথাটি বলে এসেছিলেন শঙ্খ ঘোষ। সংক্ষিপ্ত ইংরেজি ভাষণে তিনি মনে করিয়ে দিলেন, কোন আগুনের মধ্য দিয়ে চলেছি আমরা।" তিনি বললেন এই সময়টা হলো ''অ্যান এরা অব ইনটেন্স অ্যান্ড অ্যাগ্রেসিভ ভায়োলেন্স, ব্রুটাল অ্যাসল্ট অন আওয়ার ফ্রিডম অব এক্সপ্রেশন, পার্টিকুলারলি অন সেকুলার ভিউজ"—আমরা দুজনকেই চিনলাম।

কীভাবে করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের সময়ে খেলা হলো দেখুন। ২০২১-এর জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সব কিছু ঠিকঠাক চলছিল। সারা পৃথিবীতে ভারতীয় ভ্যাকসিন ৮৭টি দেশে রপ্তানি হয়েছিল। কৃষক আন্দোলন একেবারে ঝিমিয়ে গিয়েছিল। এবার এল এপ্রিল, ভোটের মাস— ৭ তারিখ বড়োসড়ো মাওবাদী আক্রমণ হলো। ১০-১৫ এপ্রিল— কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউ সুনামির মতো আছড়ে পড়ল ভারতে। পাকিস্তান বা বাংলাদেশে এরকম হলো না। ২০ এপ্রিল পুরো আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম ভারতের চিকিৎসা ব্যবস্থা ও প্রশাসনের অপ্রতুলতা নিয়ে শোরগোল তুলতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ৩-৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের মার্কিন ভ্যাকসিন ভারতে চালাতে হবে। চীন এবং তাদের বেতনভুক ভারতীয় চরেরা বলতে লাগল বিজেপি বা মোদীর তৈরি ভ্যাকসিন নিও না ওতে ক্ষতিই হবে। তার ফলে অনেক মানুষ নিল না। একটা ভ্যাকসিনের টিউব খুললে অন্তত আটজনকে দেওয়া যায়। একটা টিউব খোলার পরে চারজন নিল, বাকি নষ্ট হলো, এইভাবে প্রচুর ভ্যাকসিন নষ্ট হলো। পরে তারাই চীৎকার জুড়ল কেন ভ্যাকসিন নেই। আবার তারাই দাবি করতে লাগল বিভিন্ন জায়গা থেকে ভ্যাকসিন জোগাড় কর। পরে বলতে লাগল কেন দামের তফাত হবে? তারা বলল আমরা আমাদের রাজ্যের জন্য ভ্যাকসিনের দাম বহন করব। পরে বলল কেন্দ্রীয় সরকারকে সব দাম চোকাতে হবে। তারা আরও বলল বেসরকারি উৎপাদনকারীদের ভ্যাকসিনে অনুমোদন দিতে হবে। এখন বলছে কেন্দ্রকে সেই সব দাম মেটাতে হবে। আত্মসুখী হিন্দু ভোটার ভয়ে ভোট দিতে বেরল না। বিজেপি হেরে গেল।

লোকে মরুক মোদী ঝামেলায় পড়বে, সেটাই লক্ষ্য। এখন তারা তৃতীয় ঢেউয়ের ছড়িয়ে পড়াকে মদত দিচ্ছে। এবং সেটা শুরু হবে উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে, লিখে রাখুন। এবার সংক্ষেপে মোদীজীর কথা।

মোদী দ্বিতীয় ঢেউ বুঝতে পারেননি— ১৭ মার্চ যখন ভারতে গড় দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা ৩০০০০-এর নীচে তখন প্রধানমন্ত্রী সিএমদের সঙ্গে মিটিঙে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। প্রচুর নির্দেশিকা ও যোগাযোগ করা হয়েছিল। নেত্রী মিটিঙে যোগ দেননি।

ভারতে কোভিড কেস সর্বাধিক— মিথ্যা। লোকসংখ্যা পিছু ভারতের স্থান ১১০ নম্বরে আক্রান্ত ও মৃত্যুর নিরিখে।

মোদীর শোভাযাত্রা ও কুম্ভমেলার জন্য দ্বিতীয় ঢেউ— আবার মিথ্যা; কৃষক আন্দোলন, কেরল ও তামিলনাড়ুতে রাহুলের র‍্যালির জন্য দায়ী। মহারাষ্ট্র, কেরল, ছত্তিশগড় ও পঞ্জাব থেকে দ্বিতীয় ঢেউ ছড়িয়েছিল। সেখানে র‍্যালি করেছিল, সেখানে কুম্ভ বা নির্বাচন ছিল না। প্রতি শুক্রবার নমাজের থেকেও করোনা ছড়িয়েছে।

ভারত কেন ভ্যাকসিন রপ্তানি করেছিল? —১৭ কোটি ডোজ ভারতে দেওয়া হয়েছিল, জিএভিআই-এর উদ্যোগে দরিদ্র দেশগুলোকে ও বাকিটা চুক্তি অনুসারে মাত্র ১/৩ ভাগ রপ্তানি হয়েছিল।

কেন্দ্র ও রাজ্যগুলোর দামের তফাত— কেন্দ্র ৫০ শতাংশ তৈরি করে তা রাজ্যগুলোকে দেয় বিনা মূল্যে। রাজ্যগুলোই তা চেয়েছিল— উৎপাদন ও দর কষার স্বাধীনতা।

মৃত্যুসংখ্যা কমিয়ে দেখানো হচ্ছে— একদিকে বলছে কেন্দ্র অপদার্থ আবার অন্যদিকে বলছে কেন্দ্র এত দক্ষ যে রাজ্যগুলো থেকে পাঠানো তথ্য কমাচ্ছে। এখনকার প্রযুক্তির দিনে তা করা সম্ভব নয়। মিথ্যে করে সাধারণ মৃত্যুর চিতাকে দেখানো হচ্ছে করোনা মৃত্যু বলে।

সেন্ট্রাল ভিস্টায় কেন খরচ করা হলো? —এর পরিকল্পনা মূলত কংগ্রেস সরকারের। এর খরচ ২০০০০ কোটি কিন্তু এর জন্য সাশ্রয় হবে, তার চেয়েও বেশি। ভ্যাকসিনেশন বাজেট ৩৫ হাজার কোটি, স্বাস্থ্য বাজেট ২ লক্ষ কোটি।

ভ্যাকসিন দিতে ২-৩ বছর লাগবে। —জুলাইয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ হবে। ◻

# হিন্দু, হিন্দুত্ব এবং চিন্তন-একাদশ

**অনিকেত মহাপাত্র**

রঙিন চশমা খুলে সাদা চোখে দেখা অভ্যাস আমাদের করতেই হবে। সাম্প্রতিক সময়ে ইজরায়েল-প্যালেস্টাইন দ্বৈরথ যখন চলছিল তখন আপনার চারপাশ কেমন ছিল আর আপনার প্রতিবেশীরা কী করছিল? ভেবে দেখেছেন? এতদিন যদি নাও ভেবে থাকেন, এবার ভাবুন। বিশ্বব্যাপী এক জনমত তৈরিতে ওরা সাফল্য পেয়েছিল। আপনার পাশের মহল্লার চাঁদু-হাদুরাও কেন যেন ভয়ানক রেগে ছিল। সেই রাগ আরও তীব্র হয়েছিল যেহেতু তারা ভাই-বেরাদরদের শত্রু ইহুদিদের সামনে পাচ্ছে না। কষ্টে তাদের মুখটা কেমন রাঙা হয়ে উঠেছিল দেখেছেন? আপনার বাড়িঘর ভেঙে, আগুন দিয়ে, আপনার বউ-মেয়েদের ওপর বলপ্রয়োগ করে যে সেই রাগ মেটাবে তারও উপায় নেই। আপনারা এখনও যে সংখ্যায় কিছুটা বেশি। ওদের নেতা এবং ধর্মীয় নেতারা বলে দিয়েছেন যে চাঁদুদের এই খোয়ায়েশ পুরো হতে বেশি দেরি নেই। আর বছর কয়েক অপেক্ষা করুক, একটু ধৈর্য ধরুক। ইজরায়েলকে সমর্থন করার উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া যাবে। তাদের ক্রমবর্ধমান চাপ কেমন? ইহুদি নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্র অব্দি ইহুদি- আগ্রাসন নিয়ে 'স্টোরি' করতে বাধ্য হয়েছিল। দোর্দণ্ডপ্রতাপ আমেরিকার রাষ্ট্রপতি বাধ্য হয়েছিলেন নিজের কথা প্রায় ফিরিয়ে নিতে। অনেক দশকের ইজরায়েল বিষয়ক

মার্কিননীতি আজ মার্কিন- ভূমিতেই চ্যালেঞ্জের সামনে পড়ে গেছে। কারণটা কী? ওরা সদর দপ্তরে কামান দেগে দিতে পেরেছে। যে কোনো সিস্টেমকে কীভাবে নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে হয় তা ওরা জানে। আপনি যখন শাস্ত্রের চর্চা করেছেন তারা করেছে শস্ত্রের, পেশিশক্তির। সেই শক্তিতে অল্প সংখ্যক ওরা হয়ে গেছে অনেক। এই যদি রাজতান্ত্রিক সময়ের ন্যারেটিভ হয় তবে পরবর্তী ব্যবস্থা অর্থাৎ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে ওরা নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছে পেশিশক্তির দ্বারা অর্জিত 'জন' দিয়ে। আমাদের পূর্বজ মস্তিষ্কের ধূসর বস্তুর চর্চা করতে করতে ভুলে গিয়েছিলেন যে সেই মস্তিষ্ক কাটা পড়তে পারে। যে জাত্যভিমান নিয়ে অজস্র সংস্কার ছিল সেই জাতিটাই লাটে ওঠার জোগাড়। দায়হীন মনন আর আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচণ্ড লোভ যে এক প্রকার আত্মহত্যা; তা তাদের বোধগম্য হয়নি। আজও এই ধারা চলেছে। আর তৈরি করে রেখেছে একরকম আপাত 'শান্তিকল্যাণের' ফাঁদ। যখন আমরা নিজেদের ভাবি— বেশ আছি; বড়ো নিশ্চিন্ত। সেই প্রসঙ্গে কিছু কথার অবতারণা।

**১. 'জন্মনিয়ন্ত্রণ আইন' ফাঁদও হয়ে উঠতে পারে :**

জন্মনিয়ন্ত্রণ নিয়ে আইন প্রণয়নের কথা অনেকে বলছেন। দৃশ্যত তার দরকারও রয়েছে। কিন্তু কিছু চিন্তন দাবি করে বিষয়টি। বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যাবে; অন্তত পশ্চিমবঙ্গে— যদি জন্মনিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত আইন আনা হয় তবে হিন্দুরা মানতে শুরু করবে। প্রশাসন বাধ্য করবে মানতে। কিন্তু দ্বিতীয় সংখ্যাগুরুদের কাছে মানাতে যাবে না। যদি যায় তাহলে টিকিয়াপাড়ার উড়ন্ত লুঙ্গির দুর্দান্ত লাথি খেয়ে পরের দিন থেকে অবোধ হয়ে যাবে। এই করোনাপর্বে নিয়ম মানার যে পার্থক্য দেখলেন ওটাই দেখা যাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ-এ। তাছাড়া কাঙালি আর রঙ্গিলারা তো রয়েছে। ওরা বিভিন্ন ফাঁকফোকর দিয়ে ঠিক গলে আসবে। আজ সারা ভারতের কোথায় নেই ওরা। সুন্দরবন ভরে গেছে তাদের উপস্থিতিতে। ওরা সঙ্ঘবদ্ধ আর আপনি ভীতু সেকুলার। এই ফাঁদে পড়লে কর্পূরের মতো উবে যেতে বেশি সময় লাগবে না। দেশের এতদিনকার এতসংখ্যক 'দূরদৃষ্টিসম্পন্ন' শাসক যখন দেশটাকে ডাস্টবিন বানিয়ে যেতে পারেন। আপনি আমি তার দায় নেব কেন? আমরা অস্তিত্বের সংকটে পড়েছি। নিজেদের বেঁচে থাকার স্বার্থে হিন্দুদের অধিকতর সন্তানের জন্ম দিতে হবে। নিজেরা জন্ম দিন এবং

অন্যদের উৎসাহিত করুন। আর পারলে আর্থিকভাবে সম্পন্নরা আর্থিকভাবে দুর্বলদের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা রাখুন। একটা আদর্শ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ পরিবারের চিন্তনকে ছড়িয়ে দিন। যে পরিবারে একজন ডাক্তার, একজন শিক্ষক/অধ্যাপক, একজন বৈজ্ঞানিক এবং একজন সৈনিক হবে। যারা পরিবারকে সুরক্ষিত রাখবে পুরোপুরি, আর দেশ গড়বে।

**২. কমিউনিটি ব্যাকআপ-এর ব্যবস্থা করুন :**

হিন্দু সমাজের সমস্ত দরিদ্রদের পাশে দাঁড়ান। তাদের জীবিকা, তাদের সন্তানদের শিক্ষার দায়িত্ব নিন। কোনো সংগঠন বা এন.জি.ও-কে টাকা দেবেন না, নিজে বা কয়েকজনকে নিয়ে সরাসরি নিম্নবর্গীয় হিন্দুদের সাহায্য করুন। এক-একটা মন্দিরকে নিজেদের কর্মকাণ্ডের দ্বারা অধিকার করুন এবং তাঁকে কেন্দ্র বানান। হিন্দু সমাজের সার্বিক উন্নতিতে মন্দির সাহায্য করুক। ওখান থেকে কমিউনিটি ব্যাকআপ যাক। যেন একটি হিন্দু পরিবার দশটি সন্তানের জন্ম দিলেও তাদের সংসারে কোনো টানাটানি না থাকে। কমিউনিটি ব্যাকআপ দিন আর সেই হিন্দু সন্তানদের থেকে নিন দিনের সামান্য কিছু সময়। এই ব্যাকআপ-এর কাজটা ওরাই ভালো করতে পারবে। ভেদদৃষ্টিহীন সেবার কথা যারা বলে তাদের দ্বারা কাজের কাজ কিছুই হয় না। তাদের একসময় নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে হয়। ১৯৪৭ থেকে ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস দেখুন। টের পাবেন। এইসব আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়তে হবে। হিন্দুর জন্য, হিন্দুর দ্বারা একটি ব্যবস্থা এটি।

**৩. সরকারি-বেসরকারি অবসরপ্রাপ্তদের নতুন কিছু করার সুযোগ দেওয়া :**

অবসরপ্রাপ্তদের অভিজ্ঞতা, মেধা ও সময়কে ব্যবহার করতে হবে হিন্দুজাতির নির্মাণের কাজে। এতে তাঁদের জীবনে বেঁচে থাকার এক বৃহৎ লক্ষ্য স্থির হবে। এতে আখেরে তাঁদের গড় আয়ু বৃদ্ধি পাবে।

**৪. শাস্ত্র ও শস্ত্রের সম্মিলন :**

আমাদের উপস্যেরা কেউ শূন্য নন। তাঁরা অবয়ব-সহ অস্ত্র নিয়ে উপস্থিত। তাঁদের সশস্ত্র উপস্থিতি আমাদের সেইরূপ প্রেরণা দেয়। পৃথিবীতে যে শুধু ভালোমানুষ থাকে না, এটি অনেক দুষ্টেরও আবাসস্থল সেটি সত্য বলেই তাঁরা অস্ত্র-সহ প্রত্যক্ষগোচর হয়েছেন। তাই বাঙ্গালিকে (এটি নিয়ে পরে আলোচনা করা যাবে) অর্থাৎ হিন্দু-বাঙ্গালিকে একটি সামরিক জাতিতে পরিণত হয়ে উঠতে হবে। বাড়িতে বাড়িতে মল্লযুদ্ধ প্রভৃতি আত্মরক্ষা সংক্রান্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। বাঙ্গালির মেধা কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। মেধার চর্চা চলুক সেইসঙ্গে শক্তির চর্চাও। অসি আর মসির মধ্যে কোনো দ্বৈরথ নেই।

**৫. হিন্দুত্বকে হতে হবে স্বঃপ্রভ :**

রাজনীতিকে ব্যবহার করার জায়গায় আসতে হবে, ব্যবহৃত হতে নয়। রাজনীতি স্বেচ্ছায় হিন্দুত্বের দাসত্ব করবে।

**৬. হিন্দুয়ানি কিন্তু হিন্দুত্ব নয় :**

আচার-বিচারসর্বস্ব হিন্দুয়ানা যাঁরা করতে চান করুন। যদি তা হিন্দুর সংহতির পরিপন্থী না হয় তাহলে তার সঙ্গে হিন্দুত্বের কোনো বিরোধ নেই। কিন্তু হিন্দুত্বের পথ একটি বড়ো স্বপ্ন নিয়ে। তাই চিন্তননির্ভর ও প্রয়োগ-প্রধান হলো হিন্দুত্বের পথ।

**৭. ধর্মরক্ষক হয়ে উঠুক 'আধুনিক' মানুষেরা :**

ইসলামি দেশ পাকিস্তানের স্থপতি কোনো ধর্মীয় অভিজ্ঞানযুক্ত ব্যক্তি নন। বরং নাস্তিক একজন। তাই হিন্দু-সংস্কৃতির বিষয়ে চেতনাসম্পন্ন মানুষ তিনি যদি হিন্দুত্ব নিয়ে কাজ করতে চান। তাঁর সেই কাজের সঙ্গে হিন্দুত্বের কোনো বিরোধ নেই। হিন্দুরাষ্ট্র স্থাপনের কাজে যারা অগ্রসর হবে তারা যেই হোক না কেন তারা মিত্র। যে যে পথই গ্রহণ করুক না কেন তা যদি পথ-বাচ্য হয় তাহলে বিরোধিতার কোনো জায়গা নেই।

**৮. সনাতন আর হিন্দু : তত্ত্ব আর উপস্থাপন :**

অনাদি এই হিন্দু ধর্ম কিংবা ভারত-ধর্ম। আকাশ বাতাসের মতো স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত এই জীবনধারা। 'রেজিমেন্টেড রিলিজিওন'-এর আগ্রাসন থেকে আত্মরক্ষার জন্য সংহত হবার প্রচেষ্টা। আমাদের ধর্মবোধ অনুসন্ধান-সাপেক্ষ, অনুসরণ-সাপেক্ষ নয়। অনুসন্ধানের ঔদার্য অনেক সময় আত্মহত্যার শামিল হয়ে গেছে। সনাতন আমাদের স্পন্দন আর হিন্দুত্ব আমাদের আত্মাও বটে, আবার বর্মও।

**৯. গ্রহণের কোনো সীমা নেই, বর্জন শূন্য :**

জ্ঞান অর্জন করে জ্ঞানী হওয়া যায়। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে আত্মস্থ করতে গেলে জন-অর্জন করতে হবে। নয়তো হারিয়ে যেতে হবে পারসিদের মতো অথবা ইয়েজিদিদের মতো সম্মান খুইয়ে প্রাণ বাঁচাতে পালিয়ে বেড়াতে হবে। ইতোমধ্যে আমরা ক্রমাগত আত্মজনদের হারিয়েছি কয়েকশো বছর ধরে। এখনও হারাচ্ছি। তাই জন-অর্জনের যুদ্ধে নামতে হবে। এই যুদ্ধে হেরে গেলে পুনরুদ্ধার হওয়া মন্দির আবার অধিকৃত হবে। তাই অন্য সব উদ্দেশ্যকে দূরে সরিয়ে সামনের দুই দশকের লক্ষ্য হওয়া উচিত জন-অর্জন; এক্ষেত্রে চাণক্য শিরোধার্য। এটা সম্ভব হলে বাকি কাজগুলি নিজে থেকে হয়ে যাবে। আগ্রাসী প্রচারবিভাগ চাই। এই বিভাগ আধুনিক ম্যানেজমেন্ট-এর থেকে যুগোপযোগী পদ্ধতি নিতে পারে। প্রচারের অভিনব পন্থা নিয়ে গবেষণা ও প্রতিযোগিতা চলতে পারে।

**১০. সমস্ত ভারতজাত মত ও পথ হিন্দুত্বের আত্মজ কিংবা স্বাভাবিক মিত্র :**

ভারতভূমি থেকে উদ্ভূত মত ও পথ কিংবা ধর্ম— সেগুলি হিন্দুত্বের স্বাভাবিক বন্ধু। হিন্দুত্বের পূর্ণ অবয়বপ্রাপ্তি সেই মত-পথ কিংবা ধর্মের ভাববিকাশের সমানুপাতিক।

**১১. সমগ্র বসুধা হিন্দুত্বের বন্ধু :**

শত্রু কেউ নয়। সমস্ত বিশ্ব, সমস্ত মত, সমস্ত ধর্ম হিন্দুত্বের মিত্র। কিন্তু বারেবারে আক্রান্ত ও দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া ব্যক্তি যেমন বন্ধুহীন, আমারও আজ ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে তেমনই। আমাদের আজও নিজের কোনো দেশ নেই। □

# ভারতে পর্তুগিজ উপনিবেশ অবসানে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ভূমিকা

**সূর্যশেখর হালদার**

ভারতীয় মাত্রই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত। অহিংসা ও হিংসা— উভয় পথেই দীর্ঘদিন ধরে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যুদ্ধ চালিত হয়েছিল। অনেক বলিদান ও আত্মত্যাগের পর ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। ব্রিটিশের ইউনিয়ন জ্যাক নামিয়ে লালকেল্লার উপর উত্থিত হয় ভারতের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা। সময়টা ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট। কিন্তু তখনও ভারতের বেশ কিছু অঞ্চল পরাধীন হয়ে রয়ে গিয়েছিল। আমাদের অনেকের কাছেই এই তথ্য অজ্ঞাত যে ব্রিটিশ ছাড়াও আরও বেশ কিছু ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী দেশ ভারতের বেশ কিছু অঞ্চলকে নিজেদের অধীনস্থ করে রেখেছিল। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্টের পরেও তারা এইসব ভূখণ্ডকে ভারতের সঙ্গে বিলয় করতে অস্বীকার করে। এইসব ইউরোপীয় শক্তিগুলি হলো ফ্রান্স ও পর্তুগাল। ভারত স্বাধীন হওয়ার অনেক পরে ১৯৬১ সালে পর্তুগিজ উপনিবেশগুলি এবং ১৯৬২ সালে ফ্রেঞ্চ উপনিবেশগুলি ভারতের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়। এই নিবন্ধে অখণ্ড ভারতের যেসব অংশ পর্তুগিজদের ঔপনিবেশিক শাসনে ছিল, সেই সকল অঞ্চলে স্বাধীনতা যুদ্ধের কথা আলোচিত হবে।

ভারতে পর্তুগিজরা যে সকল অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল সেগুলি হলো গোয়া, দমন ও দিউ এবং দাদরা ও নগর হাভেলি। একত্রে এই অঞ্চলগুলি এস্তাদো দা ইন্ডিয়া নামে পরিচিত ছিল। ইংরেজ নয়, পর্তুগিজদের দ্বারা ভারতের এই অঞ্চলগুলো শাসিত হতো। সেই কারণেই ইংরেজ ভারত ছাড়ার সময় এইসব অঞ্চলগুলিকে স্বাধীন ভারত সরকারের হাতে তুলে দিয়ে যেতে পারেনি। এই অঞ্চলগুলির মধ্যে গোয়াতে পর্তুগিজ শাসন চলছিল ১৫১০ খ্রিস্টাব্দ থেকে। দমন, দিউ এবং দাদরা ও নগর হাবেলি পর্তুগিজদের দখলে ছিল ১৫০০ সাল থেকে। ১৯৪৭ সালে স্বাধীন ভারত সরকার আত্মপ্রকাশ করলেও পর্তুগিজ সরকার এই অঞ্চলগুলিকে ভারতের হাতে তুলে দিতে অস্বীকার করে। উলটে পর্তুগালের সরকার যুক্তি দেখায় যে এই অঞ্চলগুলির উপর কোনো অধিকার ভারতের নেই। কারণ ভারত নামক কোনো রিপাবলিকের অস্তিত্ব সেই সময় ছিলই না, যখন এই অঞ্চলগুলিতে পর্তুগিজ শাসনের পত্তন ঘটে। অতএব এই অঞ্চলগুলি পর্তুগালের অংশ। বাকচাতুর্যের দ্বারা সত্যকে অস্বীকার করা পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাই এটা স্বাভাবিক যে দুর্বৃত্ত, লুটেরাদের সরকার, যারা ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে অস্বীকার করে, তারা এই ধরনের কথা বলবেই। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, গোয়ার প্রাচীন নাম ছিল গোমন্ত এবং মহাভারত অনুযায়ী গোমন্ত রাজ্য ছিল দ্বারকার যাদব বংশের দ্বারা শাসিত। অর্থাৎ যে যাদব কুলে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ জন্ম নেন, সেই বংশের রাজারাই গোমন্ত রাজ্য শাসন করতেন। আবার গোয়ার অন্যতম নদী হলো মাণ্ডবী। গোয়ার রাজধানী পানাজি এই মাণ্ডবী নদীর তীরে অবস্থিত। এই নদীর নামকরণ শুনেই বোঝা যাচ্ছে যে নদীটি নামাঙ্কিত হয়েছে রামায়ণের অন্যতম চরিত্র ভরতের পত্নী তথা সীতামাতার বোন মাণ্ডবীর নামে। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে গোয়া-সহ বাকি অন্য অঞ্চলগুলো রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক— সবদিক থেকেই অখণ্ড ভারতের অংশ ছিল। কিন্তু ঔপনিবেশিক বিদেশি সরকার নিজেদের স্বার্থেই সে কথা স্বীকার করতে চাইছিল না। এই কারণেই ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের ১১ জুন ভারত সরকার লিসবনের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে।

পর্তুগাল সরকারের অসঙ্গত দাবি ভারতের সকল নাগরিককে উত্তেজিত করে তোলে। কিন্তু তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু এই বিষয়ে কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছিলেন না। তখন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে তারা পর্তুগালের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলন করবে। এই সময়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক ছিলেন শ্রীগুরুজী। তাঁর অনুমতি সাপেক্ষে ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ২ আগস্ট পুনের সঙ্ঘচালক বিনায়ক রাও আপটের পরিচালনায় একশো স্বয়ংসেবক দাদরা ও নগর হাভেলির পর্তুগিজ উপনিবেশে প্রবেশ করলেন। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক ছাড়াও এই দলে ছিলেন ইউনাইটেড ফ্রন্ট অব গোয়ানস, ন্যাশনাল মুভমেন্ট লিবারেশন অর্গানাইজেশন, আজাদ গোমন্তক দলের স্বেচ্ছাসেবকরা এবং একদল সশস্ত্র ভারতীয় পুলিশ। এই দল সঙ্ঘবদ্ধ গেরিলা কায়দায় দাদরা ও নগর হাভেলির সেলভাসায় প্রবেশ করে এবং প্রধান পুলিশ চৌকি আক্রমণ করে। এই ঘটনায় ১৭৫ জন পর্তুগাল পুলিশ বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। এই ঐতিহাসিক ঘটনাকে স্মরণ করে ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দের ২ আগস্ট সেলভাসার মানুষ একশো স্বয়ংসেবককে বীরের সম্মানে ভূষিত করে। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের ২২ জুলাই এই সঙ্ঘবদ্ধ স্বাধীনতা সৈনিকদের হাতে পর্তুগাল পুলিশ সার্জেন্ট এনিসেটো ডো রোজারিও এবং কনস্টেবল অ্যান্টোনিও

ফার্নান্ডেজ নিহত হন। ওই বছরের ২৮ জুলাই সঙ্ঘবদ্ধ স্বাধীনতা বাহিনী নারোলির দখল নেয়। এই সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে ১৯৫৫ সালের ১৫ আগস্ট রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের নেতৃত্বে কয়েক হাজার ভারতীয় পর্তুগিজ শাসিত গোয়াতে প্রবেশ করে। ওই বছরই গোয়ার একজন স্বয়ংসেবক-শিক্ষক সর্বপ্রথম পানাজি সেক্রেটারিয়েটের উপর ত্রিবর্ণ রঞ্জিত ভারতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এবং সে কারণে তিনি লিসবনের কারাগারে ১৭ বছর নির্যাতিত হন। পর্তুগিজ জেলে হাড়ভাঙা অত্যাচার সহ্য করেন জনসঙ্ঘের কার্যকর্তা জগন্নাথ রাও যোশী। যাইহোক, ১৯৫৫ সালের ১৫ আগস্ট সঙ্ঘের কার্যকর্তাদের নেতৃত্বে যে বিপুল সংখ্যক ভারতীয় পর্তুগিজ শাসিত গোয়ার মাটিতে প্রবেশ করেছিল, তাদের উদ্দেশ্য ছিল বিদেশি শাসকের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ আন্দোলন। কিন্তু পর্তুগিজ বাহিনী হিংসার দ্বারা ভারতীয়দের রোধ করার চেষ্টা করে এবং গুলি চালিয়ে ২৪ জন প্রতিবাদীকে হত্যা করে। ঔপনিবেশিকদের গুলিতে যাঁরা বলিদান দেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন সোহোদরা দেবী, রাজাভাও মহানকর প্রমুখ। এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ভারত সরকার গোয়ার দূতাবাস বন্ধ করে দেয়। তবে এখানেই এই হিংসার শেষ হলো না। ১৯৬১ সালের ২৪ নভেম্বর পর্তুগিজ সেনা একটি যাত্রীবাহী নৌকার ওপর গুলি চালায়। নৌকাটি পর্তুগিজদের দখল করা আঞ্জিদিব থেকে ভারতের কোচি বন্দরের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। এই আক্রমণে একজন যাত্রী নিহত হন এবং অনেকে আহত হন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ তখন ভারত সরকারের কাছে পর্তুগিজ উপনিবেশের উপর সামরিক আক্রমণের দাবি জানায়।

অবশেষে ভারতীয় সেনা ১৯৬১ সালের ১৮ ডিসেম্বর অপারেশন বিজয়ের সূচনা করে। পর্তুগিজ বাহিনী পরাজিত হয় এবং পরের দিন অর্থাৎ ১৯ ডিসেম্বর রাত ৮-৩০ মিনিটে পর্তুগিজ বাহিনী আত্মসমর্পণ করে। ততক্ষণে গোয়ার বেশিরভাগ অঞ্চল ভারতের দখলে চলে এসেছে। এই যুদ্ধে ২২ জন ভারতীয় সৈন্য এবং ৩০ জন পর্তুগিজ সৈন্য আত্মবলিদান দেন। অপারেশন বিজয় গোয়াতে প্রায় সাড়ে চারশো বছরের বিদেশি শাসনের অবসান ঘটায়। বেশিরভাগ আফ্রিকান দেশগুলি, ইউএসআর, শ্রীলঙ্কা (তৎকালীন সিলোন) এবং আরব দেশগুলি ভারতকে সমর্থন জানায়। ইউএসএ এবং ইউকে কিন্তু সে সময় ভারতের বিরোধিতা করেছিল। পর্তুগিজ সরকার ১৯৫৫ সালে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সত্যাগ্রহ আন্দোলনের বিরোধিতা করে এবং আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে যায়, কিন্তু তাতে লাভ কিছু হয়নি।

একথা ঠিক অপারেশন বিজয়ের মাধ্যমে ভারতীয় সেনা তাদের বীরত্বের দ্বারা গোয়া, দমন-দিউ এবং দাদরা ও নগর হাভেলিকে বিদেশি শাসনমুক্ত করে। কিন্তু সেই সঙ্গে এই মহৎ কার্যে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ভূমিকা ভুলে গেলে চলবে না। সঙ্ঘই প্রথম ভারতের সীমানার মধ্যে ৪০০ বছরের বেশি সময় ধরে চলে আসা বৈদেশিক শাসনের বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করে, সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালনা করে এবং ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে সঙ্ঘের আন্দোলন গোয়ার স্বাধীনতা যুদ্ধকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিয়ে যায়। এই আন্দোলনের সময়ে দেশের অন্যান্য রাজ্য যেমন মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশ থেকে ভারতীয় নাগরিকদের সংগঠিত করে গোয়াতে নিয়ে গিয়েছিল সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা। এইসব আন্দোলনকারীদের থাকা ও খাওয়ার দায়িত্ব ছিল সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের উপর। এছাড়াও সঙ্ঘের বেশকিছু স্বয়ংসেবক ও সেবিকা এই স্বাধীনতা আন্দোলনে আত্মবলিদান দেন। তাই আজ যে আমরা বিনা পাসপোর্ট বা ভিসাতে গোয়া কিংবা দমন ও দিউতে ছুটি কাটাতে যাচ্ছি, তার কৃতিত্ব যে ভারতীয় সেনা এবং সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের সে নিয়ে সন্দেহ নেই। ▯




ফঃ ৩

# পুরুষোত্তম জগন্নাথের কাঁঠালচুরি

**উজ্জ্বল কুমার মণ্ডল**

রঙ্গিলা ঠাকুরের রঙ্গ বোঝা বড়ো কঠিন। ঋষি মুনি তো কোন ছাড়, অমন যে প্রজাপতি ব্রহ্মা, তিনিও প্রভুর সঙ্গে চতুরালি করতে গিয়ে বিভ্রান্ত হন, ঠকে যান, চতুর্মুখে স্তব জুড়ে দেন, ক্ষমা প্রার্থনা করেন—

মহাপ্রলয়ের সময় সমস্ত বিশ্বচরাচর জলে মগ্ন হলে আপনি তখন শেষ শয্যায় শয়ন করেন এবং আপনার নাভিকমল থেকে ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়। সুতরাং আমি আপনার সাক্ষাৎ পুত্র; অতএব আমার অপরাধ আপনি ক্ষমা করুন।

ব্রহ্মার চিনতে ভুল হয়ে যায়। তিনি চেনা না দিলে ব্রহ্মা চিনবেন কী করে! আর ব্রজের গোপ-গোপী? তাঁদের কাছে তো চরম দুষ্টু এক বালক। তাঁর দস্যিপনায় তাঁরা অস্থির। তাই যশোদামায়ের কাছে অভিযোগ জানাতে এসেছেন। যশোদার কোলে যে আছেন, জড়সড় হয়ে। এতসব বয়স্কা গোপী এসেছে! তাই বুঝি বা একটু ভয়ও পেয়েছেন।

এক গোপী বলছেন— বলি, ও যশোদা, তোমার কৃষ্ণের কীর্তি শোন। দ্যাখো, কত শান্তভাবে বসে আছে এখন। কিন্তু তোমার কৃষ্ণ তো শান্ত নয়। সে ভারী দুষ্টু। কি করে জান? সে চুপচাপ আমাদের ঘরে ঢোকে, কেউ বুঝতেই পারে না। ভালোভাবে দেখে নেয়, আমরা কী করছি; আমাদের ব্যস্ত দেখে বেরিয়ে যায় আর গোদোহনের আগেই বাছুরদের ছেড়ে দেয়, আমরা যখন বাছুরদের বাঁধতে যাই, সেই ফাঁকে ঘরে ঢুকে তোমার কৃষ্ণ ক্ষীর, মাখন চুরি করে নেয়।

যশোদা সামান্য গোয়ালার স্ত্রী নন। তিনি নন্দরাজের স্ত্রী। নন্দরানি। তাঁর ছেলে চুরি করে বেড়ায়। বিষয়টা অগৌরবের। স্বভাবত তিনি বিব্রত। তাই তাদের বলেন, আমার কৃষ্ণ যখন উৎপাত করে তখন তোমরা তো শাসন করতে পার। তাহলে সে আর এরকম করে না। গোপীরা হেসে ফেলেন— তোমার কৃষ্ণকে কী শাসন করব? সে কি আমাদের ভয় করে? আমরা তর্জন গর্জন করলে সে হাসে। তার সেই হাসি দেখে আমাদের সব ভুল হয়ে যায়। যশোদা বলেন,— বুঝলাম শাসন করলে সে শোনে না। তা বাপু, আমার কৃষ্ণ বন্ধুদের নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। তার খিদে পায়। লাজুক, তাই সে চাইতে পারে না। তোমরা একটু ক্ষীর, মাখন দিলেই পার। এইটুকু ছেলে, কতটুকুই-বা খাবে।

গোপীরা অবাক। একজন বলেন— রানি, তুমি কী বলছ? আমাদের কত সাধ! তাকে একটু ক্ষীর, ননী খাওয়াই কিন্তু ক্ষীর দিতে গেলে কৃষ্ণ বলে, তোমাদের ক্ষীর ভালো নয়। তোমরা ক্ষীর তৈরি করতে জান না, আমার মা খুব ভালো ক্ষীর করে, আমার মায়ের হাতে ক্ষীর খেয়ে পেট ভরে গেছে, বিশ্বাস না হয় আমার পেটে হাত দিয়ে দেখ।

আরেক গোপী বললেন—আসলে কী জানো যশোদা, তোমার ছেলের স্বভাব এই যে, আদর করে দিলে সে খাবে না, চুরি করে খেতে সে ভালোবাসে। রহস্য এটাই। যিনি আত্মানন্দ, আপ্তকাম, আত্মক্রীড়, অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধিনায়ক, তিনি বসে আছেন যশোদার কোলে, তাঁর সাধ চুরি করে খাওয়া। আসলে অসীম যখন সীমার মাঝে আসেন তখন সীমিত জীবের মতোই তিনি লীলা করেন। প্রভু যখন আজ দাদা বলভদ্র, ভগিনী সুভদ্রাকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথরূপে অবতীর্ণ হলেন, তখনও তাঁর এই চুরি করে খাওয়ার সাধটুকু গেল না। তাই চুরি করে খাওয়ার জন্য একদিন রাতে ভক্ত রঘুদাসের কাছে গেলেন। রঘুদাসের একটু পরিচয় দেওয়া যাক।

রঘুদাস আসলে রামভক্ত, উত্তরপ্রদেশের মানুষ। তাঁর ভাব বালকের মতো, তাই শিশুর মতো সরল। যিনি যাঁরই-বা ভক্ত হন না কেন, ভক্তদের কর্তব্য তীর্থযাত্রা, তীর্থস্নান। এটি কৃতকৃত্যের মধ্যে পড়ে। রঘুদাস সেই মানসে শ্রীক্ষেত্রে এসেছেন। তিনি জানেন, রত্নবেদিতে চতুর্ধামূর্তি বিরাজমান। কিন্তু তিনি দর্শন করতে গিয়ে দেখলেন— ভগবান শ্রীরামচন্দ্র, মা সীতা, ভাই লক্ষ্মণ এবং তাঁদের পদতলে উপবিষ্ট, জোড়হস্ত, অনুগত মহাবীর হনুমান। রঘুদাস অভিভূত। এ তিনি কী দেখছেন? সবাই দেখছেন জগন্নাথ, তিনি দেখছেন সীতানাথ। তাঁর ইষ্ট, আরাধ্য! অযোধ্যায় যিনি, শ্রীক্ষেত্রেও তিনি। জগৎ জুড়েই তিনি। আনন্দের অশ্রুধারায় স্নাত রঘুদাস উপলব্ধি করলেন— জগন্নাথ আর সীতানাথ অভিন্ন। এই শ্রীক্ষেত্রে তাঁর এত ভালো লাগল যে, তিনি এখান থেকে আর অযোধ্যায় ফিরলেন না। মন্দিরের কাছে একটি কুটির বানিয়ে বসবাস করতে লাগলেন। সেখানেই সাধন ভজন করেন, শ্রীমন্দিরে নিত্য যান। মাঝে মাঝে ফুলের মালা গাঁথেন, প্রভুর গলায় পরানোর উদ্দেশ্যে।

প্রথমদিন যখন মালা নিয়ে গিয়েছিলেন মন্দিরের রক্ষীরা বাধা দিয়েছিল। বাইরের কোনো জিনিস দেবার নিয়ম নেই। জগন্নাথের নিজস্ব জমি আছে, সেখানে চাষ হয়, সেখানকার ফসল থেকে তাঁর ভোগের ব্যবস্থা হয়। নিজস্ব বাগানও আছে, সেই বাগানের ফুল থেকেই পূজা, মালা এসব হয়। বাইরের ফুল মালা মন্দিরে ঢোকে না।

প্রভু যেমন ভক্তের ভক্তির রজ্জুতে বাঁধা পড়েন, তেমনি আবার ভক্তের জন্য নিয়মও ভাঙেন। জগন্নাথের ইচ্ছায় রঘুদাস এই দুর্লভ সেবাধিকার লাভ করেছেন। শুধু রক্ষী নয়, পুরীর রাজাও তাঁকে ভালোবাসেন, সমীহ করেন। জগন্নাথের সঙ্গে তাঁর সখার সম্পর্ক। ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব— তুমিই বন্ধু, তুমিই সখা। বালকবেশী জগন্নাথ রঘুদাসের কুটিরে মাঝে মাঝে প্রায় আসেন, খেলা করেন, অসুস্থ হলে সেবাও করেন। বন্ধুর মতো। রঘুদাস সেবা নেবেন না, জগন্নাথও ছাড়বে না।

কিন্তু আজকের আমার উদ্দেশ্য ভিন্ন। প্রভু বললেন— রঘু চল, আজ আমরা রাজার বাগান থেকে কাঁঠাল চুরি করে খাব।

রঘু হতবাক, প্রভু তোমাকে কাঁঠাল চুরি করতে হবে কেন? তোমার কাঁঠাল খাওয়ার সাধ, আমি তোমাকে খুব সুন্দর কাঁঠাল এনে খাওয়াব।

প্রভু বললেন— রঘু, তুমি কিছু বোঝ না। চুরি করে খাওয়ার যে কী আনন্দ তা তুমি আজ বুঝবে।

রঘুদাস ইতস্তত করেন। প্রভু আশ্বস্ত করেন, তোমার কোনো চিন্তা নেই। চল আমার সঙ্গে। আজ চুরি করার আনন্দ যে কী তা তুমি জানবে। আমি গোপীদের ক্ষীর, ননী চুরি করে খেতাম, কেন? আমার নন্দবাবার কি ক্ষীর ননীর কিছু অভাব ছিল, না আমার মা যশোদা কৃপণ ছিল?

রঘুদাস আর কী-বা করেন? চুপিসারে প্রভুর সঙ্গ নিয়ে সতর্ক ভাবে রাজার বাগানে প্রবেশ করলেন। কেউ টের পেল না।

জগন্নাথ বললেন— রঘু তুমি গাছে উঠবে। সবচেয়ে সুন্দর ও বড় কাঁঠালটি পাড়বে এবং নীচে ফেলে দেবে। গাছের নীচে দাঁড়িয়ে থেকে আমি ধরে নেব। তারপর দুজনে কাঁঠাল নিয়ে এখান থেকে পালিয়ে তোমার কুটিরে গিয়ে ভেঙে খাব।

রঘু জগন্নাথের নির্দেশমতো গাছে উঠলেন এবং ভালোভাবে দেখে সবচেয়ে সুন্দর আর প্রকাণ্ড কাঁঠালটাই পেড়ে চাপাস্বরে বললেন— প্রভু, তুমি ধরে নিও। জগন্নাথ বললেন— তুমি ফেলে দাও, আমি ধরে নেব।

রঘুদাস কাঁঠাল নীচে ফেলতেই কাঁঠাল পতনের জোরালো শব্দ হলো। রঘুদাস অবাক। এমন শব্দ হওয়ার কথা নয়। তিনি তাকিয়ে দেখেন মাটিতে কাঁঠাল ভেঙে পড়ে আছে। গাছের নীচে বা চারপাশে জগন্নাথ নেই।

ইতস্তত করে রঘুদাস গাছ থেকে নামতেই বাগানের প্রহরী হাজির। প্রহরী রঘুদাসকে দেখে চমকে উঠেছে। ভক্ত রঘুদাস কাঁঠাল চুরি করতে বাগানে এসেছেন। বিশ্বাস হয় না।

রঘুদাস বললেন— তুমি রাজাকে খবর দাও। আমি চোর।

রাজামশায় আসতেই রঘুদাস জগন্নাথের সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করলেন। সব শুনে প্রহরী, রাজামশায় ও রাজার সঙ্গে যারা এসেছিলেন সকলে তাজ্জব বনে গেলেন। প্রভুর একী খেয়াল, এত দুষ্টুমি! ভক্ত, তুমি বড়ো ভগবান। তুমি যাও। কাল প্রভুর মন্দিরে কাঁঠাল পাঠানো হবে। তুমি তার প্রসাদ নিও।

মহাপ্রভু জগন্নাথের এই কাঁঠাল চুরি লীলা থেকে আমাদের অনুভব— ভালোবাসার গতি উভয়মুখী। ভক্ত যান ভগবানের দিকে, ভগবান যান ভক্তের দিকে। ভক্তের যেমন ভগবানকে প্রয়োজন, ভগবানেরও প্রয়োজন ভক্তকে। রবীন্দ্রনাথ যেমন অনন্য ভাষায় বলেছেন—

তাই তো তুমি রাজার রাজা হয়ে
তবু আমার হৃদয় লাগি
ফিরছ কত মনোহরণ বেশে
প্রভু নিত্য আছ জাগি।

PIONEER®
EXERCISE BOOK
Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER CO.
74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0556, Fax +91 33 2373 2596
Email: pioneerpaperco@gmail.com, www.pioneerpaper.co

সবার প্রিয়
বিল্লদা
চানাচুর

BILLADA CHANACHUR
KALIKAPUR, BOLPUR, BIRBHUM, WB
Tel.: 03463 252447, Mob.: 9434306796

# যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার
যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana®
SAREES • SUITS
Mfg. of Cotton Printed & Embroidary Sarees
Contact No. : 033-22188744 / 1386

সুরেন্দ্র চন্দ্র বসাকের
অত্যাধুনিক গয়নার
ডিজাইনের ক্যাটালগ
সুপার
যে কোন স্বর্ণকারকে দেখাতে বলুন
ক্যাটালগের জন্য যোগাযোগ করুন
9830950831

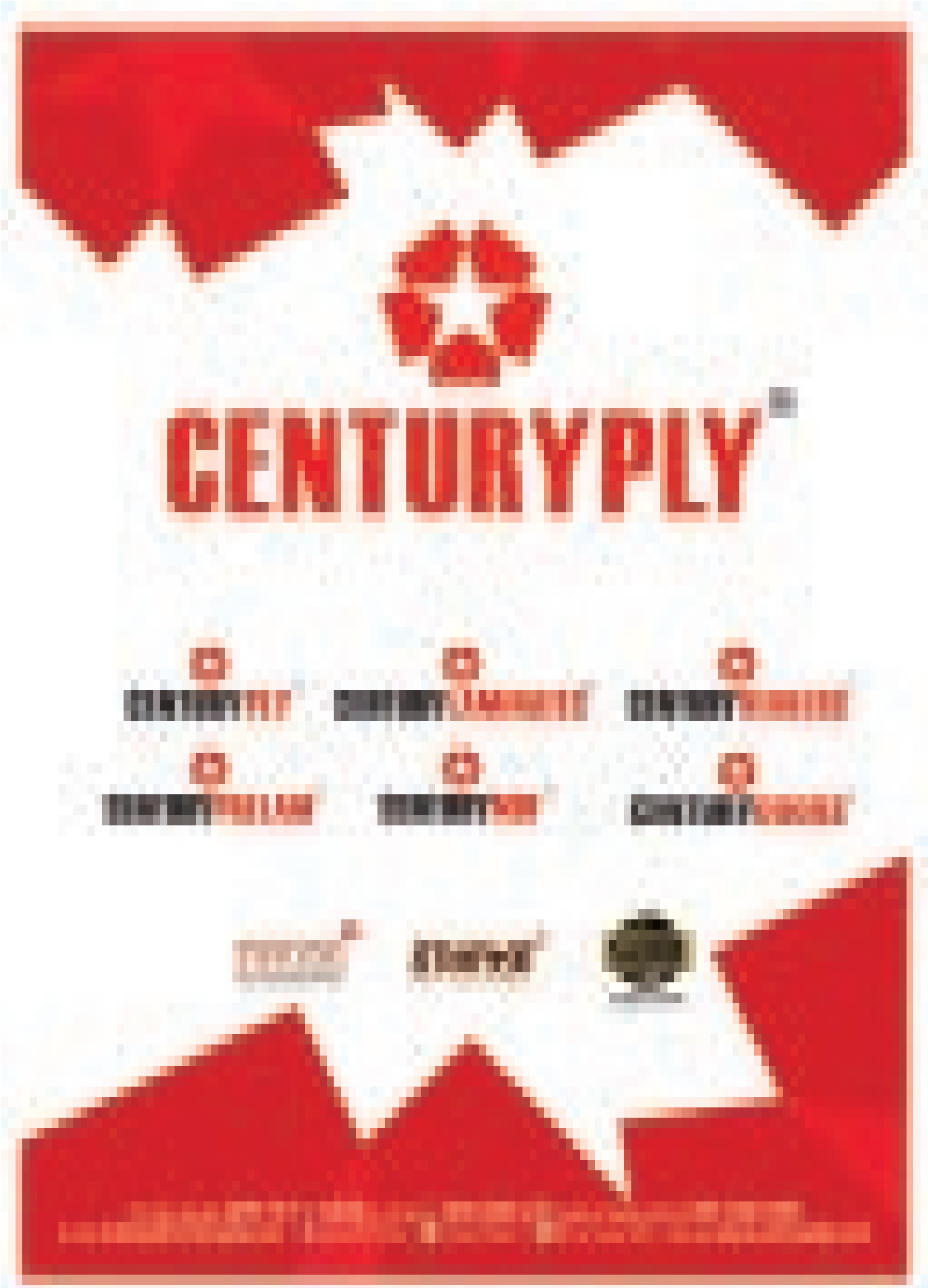
CENTURYPLY

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57
12 July - 2021 - Rs. 12.00
Postal Registration No. KOL RMS/048/2019-2021




SWASTIKA DIGITAL SWASTIKA DIGITAL swastikadigitalindia@gmail.com
Contact us Chandrachur Goswami :9674585214 Anamika Dey : 9903963088

Published and Printed by Sarada Prasad Paul on behalf of OmSwastik Prakashan Private Limited at 27/1B Bidhan Sarani, Kolkata-6. Printed at Seva Mudran, 43, Kailash Bose St. Kolkata-6. Editor : Rantidev Sengupta. ।। দাম ১২ টাকা ।।